ভাষা বীথি

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

আশা বুক এজেন্সী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন সিলেবাস অনুযায়ী **পঞ্চম ও ষষ্ঠ** শ্রেণীর জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার পুস্তক।

ভাষা বীথি

[পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

শ্রীঅধীর চ্যাটার্জি এম. এ. (ট্রিপল,)
সহকারী শিক্ষক সোদপুর দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ (বালক বিভাগ)

আশা বুক এজেন্সী
৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫শে নভেম্বর ১৯৮৭

মূল্য—বারো টাকা মাত্র।

প্রকাশ করেছেন ঃ শ্রীমতি ঝর্ণা দত্ত, ৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০ ০০০৯

মুদ্রণে ঃ নারায়ণ প্রেস, ১০৭/২ রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯

ভাষা ঃ আদিম যুগের মানুষ নানা রকম আকার ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গী ও মুখের বিচিত্র শব্দের মাধ্যমে নিজের ভাব অন্যকে বোঝাত। পশু-পাখিরা যেভাবে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে, আগেকার মানুষও তাই করতো। ক্রমে ক্রমে মানুষের মুখের সাংকেতিক শব্দগুলো থেকেই ভাষার সৃষ্টি হল। ভাষাই হল মানুষের ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যম।

কথা বলার জন্য মানুষের জিভ হলো একান্ত অপরিহার্য অঙ্গ। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র আছে। বাগ্‌যন্ত্র বলতে আমরা বুঝি জিহ্বা, কণ্ঠ (গলা), তালু (টাক্‌রা), মূর্ধা (তালুর উপরের অংশ) ইত্যাদি। শব্দ উচ্চারণ করতে দাঁত, ওষ্ঠ আর নাকও যথেষ্ট সাহায্য করে। এই সবকিছু নিয়েই মানুষের বাগ্‌যন্ত্র।

● **বাগ্‌যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অর্থবোধক শব্দ বা বাক্যই হল ভাষা।**
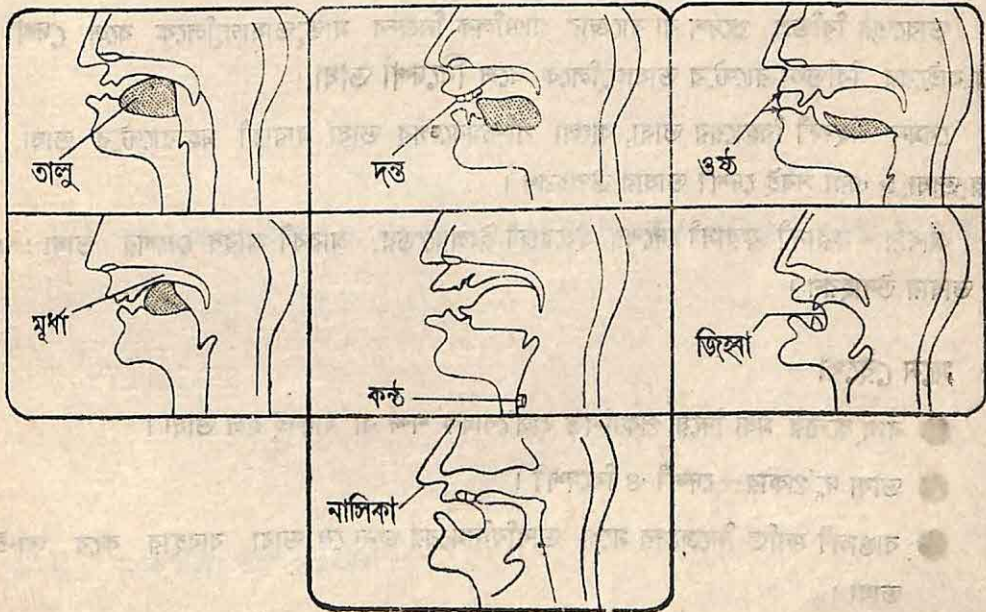
বাগযন্ত্র

মাতৃভাষা

মা-এর ভাষাই হল **মাতৃভাষা**। জন্মের পর থেকেই শিশু মাকে দেখে, মায়ের কথা শোনে। সবসময় মায়ের কাছাকাছি থাকে। মা যে ভাষায় কথা বলে, শিশুরাও প্রথম থেকেই সেই ভাষা শিখতে সুরু করে।

আমরা আমাদের মনের ভাব বাংলা ভাষায় প্রকাশ করি। কারণ, আমরা বাঙালী। সেজন্যই **বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।**

ব্যাকরণ

শুধু বলতে বা লিখতে শিখলেই হ'ল না। আমরা যা বললাম বা লিখলাম তা অর্থবোধক হওয়া দরকার। সেজন্যই মনের ভাবকে শুদ্ধ ও অর্থযুক্ত করে প্রকাশ করতে হলে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। এই নিয়মকেই আমরা **ব্যাকরণ বলে থাকি।**

● **যে গ্রন্থে কোন ভাষা শুদ্ধ ও অর্থপূর্ণভাবে বলার বা লেখার নিয়ম আলোচিত হয়, তাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।**

যে গ্রন্থে বাংলা ভাষা শুদ্ধ ও অর্থপূর্ণ ভাবে বলার বা লেখার নিয়মগুলা আলোচিত হয় তাকে **বাংলা ব্যাকরণ** বলে।

ভাষার দু'টি ভাগঃ দেশী ভাষা ও বিদেশী ভাষা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের আঞ্চলিক নিজস্ব মাতৃভাষাগুলিকে বলে **দেশী ভাষা।** ভারতের বাইরের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভাষাগুলিকে বলে **বিদেশী ভাষা।**

যেমন হিন্দী বিহারের ভাষা, বাংলা পশ্চিমবঙ্গের ভাষা, মারাঠী মহারাষ্ট্রের ভাষা, ওড়িয়া ওড়িষ্যার ভাষা। এরা সবই দেশী ভাষার উদাহরণ।

আবার – ফরাসী ফরাসী দেশের, ইংরেজী ইংল্যাণ্ডের, আরবী আরব দেশের ভাষা। এ সবই বিদেশী ভাষার উদাহরণ।

মনে রেখো –

- বাগ্‌যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অর্থবোধক শব্দ বা বাক্যই হল ভাষা।
- ভাষা দু'প্রকার— দেশী ও বিদেশী।
- বাঙালী জাতি নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে তা-ই বাংলা ভাষা।
- যে গ্রন্থে কোন ভাষায় শুদ্ধ ও অর্থপূর্ণভাবে বলার বা লেখার নিয়ম আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে।
- বাংলা ভাষা শুদ্ধ ও অর্থপূর্ণভাবে বলা বা লেখার নিয়ম যে গ্রন্থে আলোচিত হয় তা-ই হ'ল বাংলা ব্যাকরণ।

অনুশীলনী

১। আদিম কালের মানুষ কি ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করত ?

... ...

২। কি ভাবে ভাষার সৃষ্টি হল ?

... ...

৩। শব্দ উচ্চারণ করতে দেহের কোন্ কোন্ অংশ সাহায্য করে ? বাগ্‌যন্ত্র কাকে বলে ?

... ...

৪। মাতৃভাষা বলা হয় কেন ?

... ...

৫। বাংলা ব্যাকরণ পড়ার দরকার আছে কি ? কেন ?

... ...

... ...

... ...

... ...

৬। ভাষা কয় প্রকার ও কি কি ?

... ...

... .

... ...

... ...

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

যে— — বাংলা ভাষা — — ও— —ভাবে বলার বা লেখার — — আলোচিত হয়, তাকে — — বলে।

৮। কোন্‌টি কাদের মাতৃভাষা লেখ ঃ

ওড়িয়া, বিহারী, গুজরাটী, ইংরেজী, ফরাসী, আরবী।

৯। যেগুলি ঠিক তার পাশে '✓' চিহ্ন ও যেগুলি ঠিক নয় তারপাশে '×' চিহ্ন দাও ঃ

(ক) হিন্দী বিদেশী ভাষা।

(খ) মানুষ মাত্রেই এক ভাষায় কথা বলে।

(গ) মনের ভাব শুদ্ধ ও অর্থযুক্তভাবে বলা বা লেখার জনই ব্যাকরণ।

(ঘ) বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে কথা বলা হয়।

(ঙ) লেখার জন্য জিভের দরকার।

বর্ণ

আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের মুখ থেকে কতকগুলো শব্দ বের হয়। এই শব্দ গুলোকে ধ্বনি বলে। মুখের এই ধ্বনিগুলিকে লিখিতরূপ দিতে গেলে কতকগলো চিহ্ন বা সংকেতের প্রয়োজন হয়। এই চিহ্ন বা বা সংকেতেই হল **বর্ণ**। যেমন –

'রবীন্দ্র' এই শব্দটি লিখতে গেলে র, অ, ব, ঈ, ন, দ, র, অ এই সংকেত চিহ্নগুলোর প্রয়োজন হয়, আর এই চিহ্নগুলো মিলেমিশেই গঠিত হয় 'রবীন্দ্র' এই শব্দটি। এরাই শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ, এদের আর ভাঙা যায় না। এগুলিই এক-একটি **বর্ণ**। **শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশই বর্ণ।**

বাংলা ভাষায় শব্দে ব্যবহৃত "অ" থেকে "ঁ" পর্যন্ত প্রত্যেকটি এক একটি বর্ণ। এই বর্ণগুলিকেই একত্রে বলে **বর্ণমালা**। বর্ণ দু'প্রকার—

(ক) **স্বরবর্ণ** ও (খ) **ব্যঞ্জনবর্ণ**।

(ক) স্বরবর্ণ

যে সব বর্ণকে এককভাবে অন্য কোনও বর্ণের সাহায্য ছাড়াই স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা যায় তাদের স্বরবর্ণ বলে।

যেমন—আমি = (আ)+(ম+ই)।

আ এই বর্ণটি এককভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও ঔ, এই বারোটিকে স্বরবর্ণ বলে। বর্তমানে সাধারণতঃ ঌ-এর প্রয়োগ দেখা যায় না।

ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারণ করা যায় না, তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।

যেমন,— আম = (আ) + ম (ম্ + অ) 'ম' এই বর্ণটি আ এই স্বরবর্ণের সাহায্যে উচ্চারিত। বাংলা ভাষায় মোট ৩৫টি (পঁয়ত্রিশটি) ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। যেমন—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্। চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্। ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্। ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্। প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্। য্ র্ ল্ ব্। শ্ ষ্ স্ হ্ ং ঃ।

এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে ড়, ঢ়, য়, ৎ, ँ এগুলো কি ব্যঞ্জনবর্ণ নয়?

এর উত্তরে বলা যায় যে, ওরা ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকার মধ্যে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ওরা স্বতন্ত্র কোন বর্ণ নয়। ড্, ঢ্-এর পরিবর্তরূপে ড়, ঢ় ব্যবহৃত হয়।

আর য-এর বদলে য়্ হয়ে থাকে। ত্-কারের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ৎ (খণ্ড ত্), ঙ্ ঞ্ ণ্ ম্ এরা (চন্দ্রবিন্দু)-রূপে ব্যবহৃত হয়।

আরও লক্ষ্য কর ঃ

'ক' এই বর্ণটি উচ্চারণ কালে ক্ + অ-এর সাহায্য দরকার।

তেমনি— খ = খ্ + অ গ = গ্ + অ

চ = চ্ + অ ত = ত্ + অ ইত্যাদি।

বর্ণ-বিশ্লেষণ

যে-সকল স্বরবর্ণের উচ্চারণকালে অল্প সময় লাগে, তাদের **হ্রস্বস্বর** বলে। হ্রস্বস্বর পাঁচটি। যেমন—

অ ই উ ঋ ঌ

যে-সকল বর্ণ উচ্চারণ করতে গেলে অধিক সময়ের প্রয়োজন, তাদের **দীর্ঘস্বর** বলে। **দীর্ঘস্বর সাতটি।** যেমন—

আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ

ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের নাম **স্পর্শবর্ণ**। কারণ, এদের উচ্চারণ কালে **জিহ্বার** কোন-না-কোন অংশের সঙ্গে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত্য ও ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ হয়।

উচ্চারণের স্থান অনুসারে স্পর্শগুলিকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। এদের এক-একটি ভাগকে বর্গ বলে। বর্গের প্রথম বর্ণের নাম অনুসারে প্রত্যেক বর্গের নামকরণ করা হয়েছে।

যেমন— ক-বর্গ = ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ চ-বর্গ = চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্

ট-বর্গ = ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্ ত-বর্গ = ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্

প-বর্গ = প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্

প্রত্যেক বর্গে মোট পাঁচটি বর্ণ আছে। এই পাঁচটি বর্ণের প্রথম ও তৃতীয়টিকে **অল্পপ্রাণ** এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থটিকে **মহাপ্রাণ** বর্ণ বলে।

অল্পপ্রাণ বর্ণ

প্রথম বর্ণ		তৃতীয় বর্ণ	প্রথম বর্ণ		তৃতীয় বর্ণ
ক-বর্গ	ক্	গ্	ট-বর্গ	ট্	ড্
চ-বর্গ	চ্	জ্	ত-বর্গ	ত্	দ্
প-বর্গ	প্	ব্			

মহাপ্রাণ বর্ণ

দ্বিতীয় বর্ণ		চতুর্থ বর্ণ	দ্বিতীয় বর্ণ		চতুর্থ বর্ণ
ক-বর্গ	খ্	ঘ্	ট-বর্গ	ঠ্	ঢ্
চ-বর্গ	ছ্	ঝ্	ত-বর্গ	থ্	ধ্
প-বর্গ	ফ্	ভ্			

প্রতি বর্গের পঞ্চম বর্ণটিকে **আনুনাসিক বর্ণ** বলে। কারণ, এদের উচ্চারণ করার সময় নাক দিয়ে বায়ু বের করে উচ্চারণ করতে হয়।

যেমন – ঙ্ ঞ্ ন্ ণ্ ম্।

যে-সব বর্ণ উচ্চারণ কালে শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে বা শ্বাসবায়ুর জোরে উচ্চারিত হয়, তাদের বলে উষ্মবর্ণ। যেমন—

শ্ ষ্ স্ হ্

স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে যে চারিটি বর্ণের অবস্থান তাদের **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলে।

যেমন—য্ র্ ল্ ব্।

যুক্তাক্ষর

যখন একের বেশি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরবর্ণ না থাকার জন্য তাদের একত্রে বা যুক্তভাবে লেখা হয়, তাদের **যুক্তাক্ষর** বলে। যেমন—

রবীন্দ্রনাথ এই শব্দের মধ্যে 'ন্দ্র' এই অক্ষরে ন্ দ্ র্ এই তিনটি বর্ণের মাঝখানে কোনও স্বরবর্ণ নেই। ন্দ্র = ন্ + দ্ + র্ + অ।

এরা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে পরে 'অ' এই স্বরের সঙ্গে 'ন্দ্র' এইরূপে লিখিত হয়েছে। সেইজন্যই 'ন্দ্র' একটি **যুক্তাক্ষর**।

হসন্ত বর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে স্বরবর্ণ পৃথক করে নিলে সেই ব্যঞ্জনবর্ণকে আমরা হসন্ত বর্ণ বলি (এর চিহ্ন ্)।

যেমন —ক্ চ্ ট্ প্ ইত্যাদি।

স্বরবর্ণের চিহ্ন

ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হবার সময় একমাত্র অ ছাড়া অন্যান্য স্বরবর্ণের রূপ পরিবর্তিত হয়। তখন এদের চেনবার জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন,—

আ এর বদলে	া	চিহ্ন	আ এর বদলে	া	চিহ্ন
ই	,,	ি	ঈ	,,	ী ,,
উ	,,	ু ,,	ঊ	,,	ূ ,,
ঋ	,,	ৃ ,,	এ	,,	ে ,,
ঐ	,,	ৈ ,,	ও	,,	ো ,,
ঔ	,,	ৌ ,,			

এই চিহ্নগুলিকে 'আ-কার,' 'ই-কার,' 'ঈ-কার', 'উ-কার,' 'ঊ-কার,' ইত্যাদি বলেও বোঝান হয়। **অনুস্বার** (ং), **বিসর্গ** (ঃ) ও **চন্দ্রবিন্দু** (ঁ) এই তিনটি চিহ্নের মধ্যে প্রথম দু'টি স্বরবর্ণের পরে বসে এবং তৃতীয়টি স্বরবর্ণের মাথায় বসে।

অন্তঃস্থবর্ণ

অন্তঃ বা মধ্যে অবস্থিত যারা তাদেরই অন্তঃস্থ বলা হয়। য, র, ল, ব এরা স্পর্শবর্ণ ও উষ্ম-বর্ণের মাঝে আছে বলেই **অন্তঃস্থবর্ণ**।

উষ্মবর্ণ

যে বর্ণ উচ্চারণ করতে শ্বাস বায়ুর জোর বেশি লাগে তাদের **উষ্মবর্ণ** বলে। যেমন—শ, ষ, স, হ।

অযোগবাহ বর্ণ

ং এবং ঃ—এদের নিজস্ব কোন উচ্চারণ নেই। সেজন্য এদের **অযোগবাহ** বা **আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ** বলে। এ দুটির সাহায্যে অন্যান্য বর্ণের উচ্চারণে নানারকম বাহ (সাধিত) হয়। যেমন—

অ+ং=অং, ই+ং=ইং, ব+ং=বং, ও+ঃ=ওঃ ঘ+ঃ=ঘঃ।

নীচে বর্ণমালার একটি তালিকা দেওয়া হল ঃ

অনুশীলনী

১। অর্থযুক্ত একটি শব্দ লেখ।

... ...

... ...

... ...

... ...

২। আমরা কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করি ?

... ...

... ...

... ...

... ...

৩। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পার্থক্য কি ? উদাহরণ দাও।

... ...

... ...

... ...

... ...

৪। নিম্নলিখিত বর্ণগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ বর্ণ ঃ

আ, য, ম, উ, ঐ, ঈ, স, ঋ, ঝ,

... ...

... ...

... ...

... ...

৫। অযোগবাহ বর্ণ কাকে বলে ?

... ...

... ...

... ...

... ...

৬। স্পর্শবর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ বলতে কি বোঝ উদাহরণ দাও।

... ...

... ...

... ...

... ...

৭। নিচের সঠিক উত্তরের পাশে '√' চিহ্ন আর ভুল উত্তরের পাশে '×' দাও ঃ

(ক) এ আর ও হ্রস্বস্বর।

(খ) আ, ঈ, উ, ঐ, ঔ দীর্ঘস্বর।

(গ) য, র, ল, ব উষ্মবর্ণ।

(ঘ) ঐ আর ঔ যৌগিক স্বর।

(ঙ) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ত-বর্গের বর্ণ।

শব্দ

নিচের শব্দগুলো লক্ষ্য কর—

মই = ম্ + অ + ই (তিনটি বর্ণের মাধ্যমে)

মানুষ = ম্ + আ + ন্ + উ + ষ + অ (ছটি বর্ণের মাধ্যমে)

কলা = ক্ + অ + ল্ + আ (চারটি বর্ণের মাধ্যমে)

উপরের শব্দ তিনটির দ্বারা এক একটি জিনিস স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু যদি ঘুরিয়ে বলা হয় —

ইম, নুষমা, লাক—তাহলে এদের কোন অর্থই হবে না।

সেজন্যই, **অর্থযুক্ত এক বা একাধিক কতকগুলো বর্ণের সমষ্টিকে শব্দ বলা হয়।**

বাক্য

আমি বল।

গোলাপ ফুল দেখতে।

উপরের বাক্য দু'টিতে কতকগুলো শব্দ পরপর লেখা হয়েছে। এতে কি মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে ? না তা পায়নি। কিন্তু যদি লেখা হয় —

আমি বল খেলছি।

গোলাপ ফুল দেখতে সুন্দর।

এই বাক্য দু'টিতে কিন্তু মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে, পরপর কতকগুলি শব্দ বসালেই চলবে না। বাক্য হতে গেলে তার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা থাকা চাই কিংবা অর্থবোধক হওয়া চাই।

যে সব শব্দ পরপর সাজিয়ে মনের কোন ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়, সেই সব শব্দগুলির সমষ্টিকে বাক্য বলা হয়।

বাক্যের প্রকারভেদ

নানারকমের বাক্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের নানা ধরনের মনের ভাব প্রকাশ করি। ভাব প্রকাশের এই সব ধরন অনুসারে বাক্যের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। বাক্যের ভাব প্রকাশের ধরন অনুসারে বাক্যকে **পাঁচ ভাগে** ভাগ করা হয়। যেমন —

(ক) প্রশ্নবাচক বাক্য ;

(খ) আবেগ সূচক বাক্য ;

(গ) অনুজ্ঞাবোধক বাক্য ;

(ঘ) ইচ্ছাসূচক বাক্য ;

(ঙ) বর্ণনাত্মক বাক্য ;

(ক) প্রশ্নবাচক বাক্য

লেখাপড়া করে কি হবে ?

পাত্রমিত্র সবাই বলল—কেন পারব না ?

ওপরের বাক্যগুলি লক্ষ্য কর। এই বাক্যে মনের কি ধরনের ভাব প্রকাশ করা হয়েছে ? বক্তার জানার ইচ্ছা বা জিজ্ঞাসাবোধক বা প্রশ্ন করার ধরন প্রকাশ করা হয়েছে বলে এগুলি এক একটি **প্রশ্নবাচক** বাক্য।

যে-সব বাক্য দিয়ে কোন কিছু জানার ইচ্ছা প্রকাশ করা বা প্রশ্ন করা হয়, তাদের প্রশ্নবাচক বাক্য বলে।

(খ) আবেগসূচক বাক্য

কি সুন্দর ছবি !

এসব সে গ্রাহ্যই করলে না !

উপরের বাক্যগুলির প্রথমটিতে বিস্ময়ের কথা ও দ্বিতীয়টিতে ভয়শূন্যতার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষভাবে মনের আবেগ প্রকাশিত হয়েছে বলে এই বাক্য দুটি **আবেগসূচক বাক্য।**

যে বাক্য দিয়ে মনের আনন্দ, বিস্ময়, দুঃখ, চিন্তা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়, তাদের আবেগসূচক বাক্য বলে।

(গ) অনুজ্ঞাবোধক বাক্য

আপনি আসন গ্রহণ করুন।

ওকে খান দশেক পিঠে দাও।

ওপরের প্রথম বাক্যটিতে বক্তার অনুরোধ ও দ্বিতীয় বাক্যটিতে বক্তার আদেশ সূচিত হয়েছে। অনুরোধ ও আদেশ সূচিত হয়েছে বলে এই বাক্য দুটি **অনুজ্ঞাবোধক বাক্য।**

যে বাক্য দ্বারা আদেশ, অনুরোধ প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞাবোধক বাক্য বলে।

(ঘ) ইচ্ছাসূচক বাক্য

তিনিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

ঈশ্বর, আমরা যেন জয়লাভ করি।

প্রথম বাক্যটিতে বক্তার মনের বিশেষ ইচ্ছা ও দ্বিতীয়টিতে মনের প্রার্থনা সূচিত হয়েছে। সেই কারণে এই বাক্য দুটি **ইচ্ছাসূচক বাক্য।**

যে বাক্যের দ্বারা বক্তার মনের প্রার্থনা, আগ্রহ বা বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশিত হয় তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে।

(ঙ) বর্ণনাত্মক বাক্য

লম্বা ছিপখানা মন্থর গতিতে যাচ্ছে।

রাজার ভারি অসুখ।

উপরের বাক্য দুটি লক্ষ্য কর। ছিপখানা কেমন? লম্বা। কেমন ভাবে যাচ্ছে? মন্থর গতিতে। রাজার কেমন অসুখ? ভারি অসুখ। এখানে বক্তার কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, প্রার্থনা বা আদেশ কিছুই সূচিত হয় নি। সাধারণভাবে শুধু বর্ণনা করা হয়েছে। সেজন্যই এই বাক্য দুটি এক-একটি **বর্ণনাত্মক বাক্য।**

যে বাক্যের দ্বারা সাধারণভাবে কোন বিষয়ের বর্ণনা করা হয়, তাকে বর্ণনাত্মক বাক্য বলে।

ওপরে আলোচিত এই পাঁচ প্রকারের বাক্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) ইতিবাচক ও (খ) নেতিবাচক।

(খ) 'ইতি' অর্থাৎ আছে। যে-সব বাক্যে 'আছে' এই অর্থ প্রকাশ করে তাদের ইতিবাচক বাক্য বলে।

যেমন—সুন্দরবনে বাঘ থাকে।

(খ) 'নেতি অর্থাৎ 'না'। যে-সব বাক্যে 'না' এই অর্থ প্রকাশিত হয়, তাদের নেতিবাচক বাক্য বলে।

যেমন তার নিন্দা করা যায় না।

গঠনের দিক দিয়ে আবার বাক্যকে মোট **তিনটি শ্রেণীতে** ভাগ করা যায়—

(ক) সরল বাক্য,

(খ) জটিল বাক্য, ও

(গ) যৌগিক বাক্য।

গঠনপ্রণালী অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদের আলোচনা তোমরা উঁচু শ্রেণীতে গিয়ে শিখবে।

- অর্থযুক্ত এক বা একাধিক বর্ণের সমষ্টিকে শব্দ বলা হয়।
- যে সব শব্দ পরপর সাজিয়ে মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা হয়, সেই শব্দসমষ্টিকেই বাক্য বলে।
- ভাব প্রকাশের ধরন অনুসারে বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

অনুশীলনী

১। শব্দ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

২। বাক্যের সংজ্ঞা কি ? বাক্য কত প্রকার ও কি কি ?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

৩। ভাব প্রকাশের ধরন অনুসারে বাক্যকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ? তাদের নাম কি কি ?

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

৪। কোন্‌টি শব্দ আর কোন্‌টি শব্দ নয় তা নীচের সঠিক ঘরে বসাও।

মানুষ, ফুল, লেছে, নবল, বিদ্যালয়, ধরিত্রী, শপ্রংসা, নারায়ণ, চিৎকার, প্রতীক্ষা।

শব্দ	শব্দ নয়	শব্দ	শব্দ নয়

৫। নীচে যেগুলি শুদ্ধ বাক্য পাশে '✓' চিহ্ন দাও এবং অশুদ্ধ বাক্যের পাশে '×' চিহ্ন দাও।

(ক) বাঘের খাদ্য মাংস।

(খ) গরু রাখাল মাঠে চরায়।

(ঘ) বিদ্যালয়ে চিকিৎসা করা হয়।

(ঘ) মানুষ মরণশীল।

৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌ বাক্য শূন্যস্থানে লেখ :

(ক) চারিদিক আলোকিত হয়েছে। ... ...

(খ) তোমার বাবার নাম কি ? ... ...

(গ) আমরা সবাই চমকে উঠলাম। ... ...

(ঘ) এ তো খুব আনন্দের কথা ! ... ...

(ঙ) আমি যেন ডাক্তার হতে পারি। ... ...

(ঢ) রাজার ভারি অসুখ। ... ...

(ছ) তোমাদের ছুটি, এখন যেতে পার। ... ...

১। ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে।

২। শ্যামল ও বিমল লিখছে।

১নং বাক্যটিতে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। এখানে 'ছেলেদের' উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে 'খেলছে।' আর, ২নং বাক্যে শ্যামল ও বিমল লিখছে। এই বাক্যে, 'শ্যামল ও বিমল'কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে 'লিখছে'। উপরের দু'টি বাক্যেই 'ছেলেরা' এবং 'শ্যামল ও বিমল' **উদ্দেশ্য।**

বাক্যের মধ্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কোন কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে।

আবার দেখো, ১নং বাক্যে 'ছেলেদের' উদ্দেশ্য করে কি বলা হয়েছে ? – তারা 'ক্রিকেট খেলছে'। তেমনি ২নং বাক্যে 'শ্যামল ও বিমল'কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তারা 'লিখছে'। আগেই বলা হয়েছে 'ছেলেরা' আর 'শ্যামল ও বিমল' উদ্দেশ্য। এখানে 'ক্রিকেট খেলছে' ও 'লিখছে' এই কথাগুলো উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সে জন্য এরা **বিধেয়।**

বাক্যের মধ্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তা-ই বিধেয়।

মনে রেখো—

- বাক্যের দু'টি অংশ – উদ্দেশ্য ও বিধেয়।
- বাক্যের মধ্যে যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে।
- বাক্যের মধ্যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তাকে বিধেয় বলে।

অনুশীলনী

১। বাক্যের কটি অংশ ? কি কি ?

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … …

২। উদ্দেশ্য ও বিধেয় কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

... ...

... ...

... ...

... ...

৩। নীচের বিষয়গুলিকে উদ্দেশ্য করে বাক্য রচনা কর ঃ
ডোরাক, কাণ্ডী, হান্স, বুদ্ধদেব, বাবা ও মা, ছাত্রগণ।

৪। নীচের ছকে বাক্যগুলিকে উদ্দেশ্যে ও বিধেয়ে ভাগ করে দেখাও ঃ

(ক) তারা মনের আনন্দে খেলছে।

(খ) আমরা খেলা দেখতে যাবো।

(গ) অশোক কলিঙ্গ বিজয় করেন।

(ঘ) এজন্য নীলের দরকারও বেড়ে যায়।

(ঙ) আমরা মাদ্রাজ বেড়াতে যাব।

(চ) একটি ট্রেন আসছে ধোঁয়া উঁড়িয়ে।

উদ্দেশ্য	বিধেয়

নানা ধরনের চিহ্ন দিয়ে কোন বাক্য সাধারণভাবে বলা হল কিনা, বাক্যটি দিয়ে কোন প্রশ্ন করা হল কিনা বা মনের কোন বিশেষভাব প্রকাশ করা হল কিনা তা বোঝা যায়। কথা বলার সময় শ্বাস নেওয়ার জন্য, জিভের বিশ্রামের জন্য, বাক্যের অর্থকে বুঝতে সাহায্য করার জন্য বাক্যের মাঝে মাঝে বক্তাকে থামতে হয়। থামার জন্যও বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার।

যে চিহ্ন বাক্যের মধ্যে অল্প সময়, বেশি সময় বা সম্পূর্ণরূপে থামার নির্দেশ সূচনা করে তাকে বিরাম বা ছেদ চিহ্ন বলে।

আমরা সাধারণতঃ বাক্যের মধ্যে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহার করে থাকি ঃ—

(ক) কমা (,)
(খ) সেমিকোলন (;)
(গ) দাঁড়ি (।)
(ঘ) প্রশ্নবোধক (?)
(ঙ) বিস্ময় সূচক (!)
(চ) উদ্ধৃতি ("—")।

(ক) কমা (,) ঃ

বাক্যের যেখানে খুব কম সময়ের জন্য থামার প্রয়োজন, সেখানে এই চিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন—

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

(খ) সেমিকোলন (;) ঃ

বেশি সময় থামার জন্য বা ভিন্ন ভিন্ন বাক্যকে এক সংগে তাড়াতাড়ি পড়ার জন্য সাধারণ ভাবে এই চিহ্নের ব্যবহার হয়। যেমন—

যা চকচক করে ; তাই সোনা নয় ; এটা জানা উচিত।

(গ) দাঁড়ি (।) ঃ

যেখানে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে বাক্যটির সমাপ্তি সূচনা করে সেখানেই দাঁড়ি ব্যবহার হয়। যেমন —

এক ছিল রাজা। রাজার ভারি অসুখ।

(ঘ) প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) ঃ

যে সব বাক্যে কোন প্রশ্ন করা হয়, তাদের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তুমি কি এবার পরীক্ষা দেবে ?

(ঙ) বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) ঃ

যে সব বাক্যে আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময় প্রভৃতি মনের নানা ভাব প্রকাশ করা হয়, তাদের শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন—

এ কথা ভাবাই যায় না ! কি তামাসা !

(চ) উদ্ধৃতি চিহ্ন (' ") ঃ

বক্তা যে ভাবে কথা বলে সেই কথাগুলো অবিকল বক্তার মত করে প্রকাশ করতে হলে, বক্তব্যের শুরু ও শেষে এই উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন –

সবাই শুনে বললো - "এ তো চমৎকার কথা।"

মনে রেখো

- বক্তার মনের ভাব প্রকাশের ধরনের জন্য বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার হয়।
- জিহবার বিশ্রামের জন্য, বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট করার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাকে ছেদ বা বিরাম চিহ্ন বলে। সাধারণতঃ কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক, বিস্ময়সূচক ও উদ্ধৃতি প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

১। লিখতে বা পড়তে গেলে মাঝে মাঝে আমাদের থামতে হয় কেন ?

... ...

... ...

... ...

... ...

২। উদ্ধৃতি চিহ্ন আছে এমন তিনটি বাক্য লেখ।

... ...

... ...

... ...

৩। প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার হয় কেন ?

… … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

৪। বিস্ময়সূচক চিহ্ন কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয়? দুটি উদাহরণ দাও।

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

৫। কমা, সেমিকোলন ও দাঁড়ির মধ্যে পার্থক্য কি ?

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

৬। নীচের কবিতাটিতে যেখানে যে চিহ্ন বসবে তা বসাও ঃ

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে
তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে ওঠে পাখির ডাকে জেগে
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।

ভাষার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ যথাযথভাবে প্রকাশ করার জন্য আমরা লিখি। লেখার মূল উপাদান হ'ল শব্দ। আবার বিভিন্ন শব্দের সাহায্যে গড়ে ওঠে এক একটি বাক্য। এই বাক্য আবার বিভিন্ন পদের সমষ্টিমাত্র। তাহলে পদ কি? **বিভক্তিযুক্ত শব্দই হল পদ।** বাক্যের মধ্যে শব্দ প্রয়োগ করতে হলে শব্দের পরে বিভক্তি যোগ করতে হয়। যেমন—ছাত্রের কর্তব্য অধ্যয়ন। এখানে 'ছাত্র' শব্দের সংগে 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

বিভক্তি যুক্ত শব্দ এবং ধাতুকে পদ বলে।

শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য হল পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্তিহীন অবস্থায় ব্যবহৃত অর্থযুক্ত বর্ণের সমষ্টিই শব্দ। আর, বাক্যের মধ্যে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে সেই শব্দই হয় পদ।

বাংলা বাক্যের মধ্যে পদ পাঁচ রকমভাবে কাজ করে। সেজন্য পদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

(ক) বিশেষ্য, (খ) বিশেষণ, (গ) সর্বনাম, (ঘ) ক্রিয়া ও (ঙ) অব্যয়।

(ক) বিশেষ্য

চোরকে সকলে ঘৃণা করে।

তিনি একাকী **ভ্রমণ** করিতেছেন।

উপরের বাক্য দুটির প্রথমটিতে 'চোরকে' বলতে বুঝায় একটি মানুষ। আর দ্বিতীয় বাক্যে 'ভ্রমণ' বলতে বোঝায় একটি কাজের নাম। এখানে 'চোর' এবং 'ভ্রমণ' **বিশেষ্য পদ।**

যে পদ দ্বারা বস্তু, সংজ্ঞা, জাতি, গুণ বা ক্রিয়ার নাম বুঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্য পদের শ্রেণী বিভাগ

বিশেষ্য পদকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়ঃ—

(১) নামবাচক, (২) জাতিবাচক, (৩) বস্তুবাচক, (৪) সমষ্টিবাচক, (৫) গুণবাচক, এবং (৬) ক্রিয়াবাচক।

(১) নামবাচক বিশেষ্য—যে বিশেষ্য পদে কোন ব্যক্তি, স্থান, নদী, পর্বত, গ্রন্থ ইত্যাদির নাম বোঝায়, তাকে **নামবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন—গঙ্গা, হিমালয়, মহাভারত, অশোক, কলকাতা, ইত্যাদি।

(২) **জাতিবাচক বিশেষ্য** যে পদের দ্বারা সমগ্রভাবে কোন জাতির নাম বোঝায়, তাকে **জাতিবাচক বিশেষ্য পদ** বলে। যেমন—বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান, মানুষ, পাখি, গরু, খ্রীস্টান, শিখ ইত্যাদি।

(৩) **বস্তুবাচক বিশেষ্য** যে বিশেষ্যপদ দ্বারা কোন বস্তুর নাম বোঝায়, তাকে **বস্তুবাচক বিশেষ্য পদ** বলে। যেমন—স্বর্ণ, চাউল, তেল, কাগজ, কলম, জল, ইত্যাদি।

(৪) ,**সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** যে বিশেষ্য পদ কোন একটি ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে বহু ব্যক্তি বা বস্তুকে 'সঙ্ঘবদ্ধ' একটি নামের আকারে বুঝায়, তাকে **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন—শ্রেণী, সমিতি, সংঘ, জনতা, দল, ঝাঁক, ক্লাব, বাহিনী ইত্যাদি।

(৫) **গুণবাচক বিশেষ্য** - যে বিশেষ্যের দ্বারা গুণ, দোষ বা অবস্থার নাম বোঝায়, তাকে **গুণবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন—দারিদ্র্য, মাধুর্য, মালিন্য, ক্ষমা, বিনয় ইত্যাদি।

(৬) **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য**—যে বিশেষ্যের দ্বারা কোন কাজ বা ক্রিয়ার নাম বোঝায়, তাকে **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন শয়ন, ভোজন, দান, প্রার্থনা, ভ্রমণ, গমন, ছেদন, ইত্যাদি।

(খ) সর্বনাম পদ

হান্সের শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। ঐ গর্ত সে কিছুতেই বড় হতে দেবে না। - বাঁধ সে রক্ষা করবেই।

উপরের বাক্যে সে এই পদটি কার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে?—'হান্সের' পরিবর্তে। সে শব্দটি ব্যবহার না করে "হান্সের" শব্দটি ব্যবহার করলে কোন ক্ষতি না হলেও বারবার একই শব্দ ব্যবহার করলে শুনতে বা পড়তে ভাল লাগত না। "হান্স" পদটি বিশেষ্য। বারবার একই **শব্দ** ব্যবহার না করে 'হান্সের' বদলে 'সে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য সে শব্দটি **সর্বনাম পদ।**

এই রকম **বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।**

সর্বনাম পদ নিম্নলিখিত নয় প্রকার ঃ—

১। **ব্যক্তিবাচক**—আমি, তুমি, সে, আপনি ইত্যাদি।

২। **নির্দেশসূচক**—এ, এরা, ওই, ওরা, ইহা, উহা, উনি, ইনি ইত্যাদি।

৩। **সাকল্যবাচক**—সব, সকল, সর্ব, উভয় ইত্যাদি।

৪। **সংযোগবাচক**—যে, যাহা, যিনি ইত্যাদি।

৫। **নিত্যসম্বন্ধীয়** - যে-যে, যাহারা-তাহারা, যাহা-তাহা ইত্যাদি।

৬। **প্রশ্নবাচক**—কে, কোন, কি ইত্যাদি।

৭। **অনিশ্চয়াত্মক**—কেহ, কিছু, কোন ইত্যাদি।

৮। **আত্মবাচক**—নিজ, আপনি, স্বয়ং, নিজেই ইত্যাদি।

৯। **অন্যাদিবাচক**—অন্য, অপর, অমুক ইত্যাদি।

(গ) বিশেষণ পদ

রাজার **ভারি** অসুখ।

অসুখ সারাবার উপায় আমি জানি, কিন্তু সে **ভারি শক্ত**।

রাজার কেমন অসুখ? উপায়টা কেমন? দুটি প্রশ্নের উত্তরই—**ভারি**। সুতরাং **ভারি** এই পদটি **অসুখ** এই **বিশেষ্যটিকে** ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। সেজন্য এরা প্রত্যেকেই **বিশেষণ পদ**।

এই রকম, **যে পদের দ্বারা কোন বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া বা ক্রিয়ার বিশেষণকে বিশেষ করে বা ভাল করে বুঝান হয়, তাকে বিশেষণ পদ বলে।**

বিশেষণ পদ আবার তিন প্রকার। **বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ** আর **ক্রিয়ার বিশেষণ।**

বিশেষ্যের বিশেষণ ঃ যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য পদের গুণ প্রকাশ করে তাকে **বিশেষ্যের বিশেষণ** বলে।

যেমন **সাদা** ফুল, **সুন্দর** ছবি, **বুদ্ধিমান** ছাত্র প্রভৃতি।

বিশেষণের বিশেষণ ঃ যে পদের দ্বারা বিশেষণ পদের গুণ প্রভৃতি প্রকাশ করা হয় তাকে **বিশেষণের বিশেষণ** বলে। যেমন—**টুকটুকে** লাল ফুল। **অতি** সুন্দর ছবি। **খুব** বুদ্ধিমান বালক।

ক্রিয়ার বিশেষণ ঃ যে পদের দ্বারা ক্রিয়াটি কখন, কোথায়, কিভাবে সম্পন্ন হয় ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে **ক্রিয়ার বিশেষণ** বলে। যে—

ধীরে কথা বল। **দ্রুত** দৌড়াও।

(ঘ) ক্রিয়াপদ

তিনি ভাত **খাচ্ছেন।**

বালকেরা খেলা **করছে।**

উপরের বাক্য দুটিতে **খাওয়া** ও **করছে** উভয়েই **খাওয়া করা** এই কাজগুলি বুঝাচ্ছে। খাওয়া ও করা 'কাজ' করা বুঝাচ্ছে বলেই এরা **ক্রিয়াপদ**।

এই রকম, **যে পদ দ্বারা কোন কিছু করা, থাকা বা হওয়া প্রভৃতি বুঝায় তাকে, ক্রিয়াপদ বলে।**

ক্রিয়াপদের শ্রেণী বিভাগ

ক্রিয়াপদকে মোট চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—

(১) সমাপিকা, (২) অসমাপিকা, (৩) সকর্মক ও (৪) অকর্মক ক্রিয়া।

সমাপিকা ক্রিয়া—যে ক্রিয়ার সাহায্যে বাক্য সমাপ্ত হয়, তাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে।

যেমন— বাল্মীক রামায়ণ **লিখেছেন**।

অসমাপিকা ক্রিয়া –যে ক্রিয়া বাক্যকে সম্পূর্ণ করতে পারে না এবং অন্য কোন সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করে বাক্যকে সম্পূর্ণ করে, তাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। অসমাপিকা ক্রিয়া সাধারণত ধাতুর সঙ্গে 'ইয়া', 'ইলে', 'ইতে', প্রভৃতি যোগে গঠিত হয়। যেমন–তাহাকে **দেখিয়া** বড়ই দুঃখ হইল। চাঁদ উঠিলে চারিদিক আলোকিত হয়।

সকর্মক ক্রিয়া– যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাকে **সকর্মক ক্রিয়া** বলে। যেমন—

আমি সমুদ্র **দেখিতেছি**।

শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে **পড়ান**।

উপরের বাক্যগুলিতে কি **দেখিতেছি** ? কাহাকে পড়ান ? প্রশ্ন করিলে পরপর উত্তর পাওয়া যায় 'সমুদ্র' ও 'ছাত্রকে'। ক্রিয়াকে 'কি' অথবা 'কাহাকে' দিয়া প্রশ্ন করিলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকেই ক্রিয়ার **কর্ম** বলে। সেজন্য উল্লিখিত ক্রিয়াগলি সকর্মক।

অকর্মক ক্রিয়া—যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না তাকে **অকর্মক ক্রিয়া** বলে। যেমন—রাম **খাইতেছিল**। তাহারা **হাসে**।

এই বাক্যগুলিতে 'কি', অথবা 'কাহাকে' দিয়া প্রশ্ন করিলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ এদের কোন কর্ম নেই।

সুতরাং উল্লিখিত ক্রিয়াগুলি **অকর্মক**।

(ঙ) অব্যয়

তাঁরা **তো** আসেন নি।

বাবা **গো** মেরে ফেললে গো বলে পালালো।

হ্যাঁ, আমি পরাজিত হয়েছি।

'ব্যয়' কথার অর্থ খরচ। 'অ-ব্যয়'-এর অর্থ যার ব্যয় বা খরচ নেই। উপরের বাক্যগুলিতে **তো**, **গো** আর **হ্যাঁ** এরা এক-একটি **অব্যয়**। কারণ কোন সময়েই এদের রূপের কোন বদল বা পরিবর্তন হয় না। সব অবস্থায় একই রকম থাকে।

এই রকম, **যে-সমস্ত শব্দ বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হলেও কোন রকমেই যাদের রূপের পরিবর্তন হয় না, তাদের অব্যয় বলে।**

অব্যয়ের শ্রেণী বিভাগ

অব্যয়কে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। নীচে সেই শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল ঃ—

(ক) **বাক্যান্বয়ী অব্যয় ঃ** এই অব্যয়কেও আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—

(i) সংযোজক ঃ ও, আর, এবং, প্রভৃতি।

(ii) হেতুবাচক ঃ সুতরাং, অতএব প্রভৃতি।
(iii) বিয়োজক ঃ না, অথবা, নহিলে প্রভৃতি।
(iv) সঙ্কোচক ঃ কিন্তু, বরং, তবে প্রভৃতি।

(খ) **পদান্বয়ী অব্যয় ঃ** যেমন—সঙ্গে, সহিত, দ্বারা, ব্যতীত প্রভৃতি।

(গ) **অনন্বয়ী অব্যয় ঃ** যেমন—মরিমরি, ছিছি, কেন, নাকি, কি, ওহে, ওরে প্রভৃতি।

(ঘ) **ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ঃ** যেমন—ভন্ভন্, পত্পত্, টন্টন্, কট্কট্ প্রভৃতি।

(ঙ) **ঘৃণা ও বিরক্তিসূচক অব্যয় ঃ** যেমন—ছি! ধিক্!

মনেরেখো ঃ—

- বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতুকে পদ বলে।
- পদ পাঁচপ্রকার। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়।
- বিশেষ্য পদ ছ'ভাগে, বিশেষণপদ তিনভাগে, সর্বনামপদ আট ভাগে, ক্রিয়া দু'ভাগে আর অব্যয় দু'ভাগে বিভক্ত।

অনুশীলনী

১। পদ কাকে বলে? শব্দ ও ধাতুর পার্থক্য কি?

... ...

... ...

... ...

... ...

২। বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

... ...

... ...

৩। ঠিক উত্তরটি রেখে ভুল উত্তরটি কেটে দাও ঃ

খুব—ক্রিয়ার বিশেষণ / বিশেষণের বিশেষণ / বিশেষ্যের বিশেষণ।
বহু—বিশেষণের বিশেষণ / বিশেষ্যের বিশেষণ / ক্রিয়ার বিশেষণ।
মৃদুমন্দ—বিশেষ্যের বিশেষণ / বিশেষণের বিশেষণ / ক্রিয়ার বিশেষণ।
মেটে—বিশেষণের বিশেষণ / বিশেষ্যর বিশেষণ / ক্রিয়ার বিশেষণ।
শ্যামল—বিশেষ্যের বিশেষণ / বিশেষণের বিশেষণ / ক্রিয়া বিশেষণ।
সেই—বিশেষ্যের বিশেষণ / বিশেষণের বিশেষণ / ক্রিয়ার বিশেষণ।

৪। নিচে দেওয়া ক্রিয়াগুলির ধাতু ও বিভক্তি পৃথক ক'রে দেখাও :

ক্রিয়াপদ	ধাতু + বিভক্তি	ক্রিয়াপদ	ধাতু + বিভক্তি
খেলিতেছে	...+...	মরবে	...+...
পড়িবে	...+...	পড়লো	...+...
গিয়া	...+...	হইলেন	...+...
আসিয়াছে	...+...	বুঝাইতেছে	...+...
আসিয়াছিল	...+...	পড়িতেছি	...+...

৫। নীচের পদগুলি থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে ছকে বসাও :

মহাভারত, লাল, রহিম, তিন, ছোট, শ্রীলংকা, স্নেহ, মায়া, তাড়াতাড়ি, হিমালয়, পাকা, আলো, দক্ষিণ।

বিশেষ্য	বিশেষণ

৬। নীচের বাক্যগুলি থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ খুঁজে বের করে ছকে লেখ :

(ক) রাজার ভারি অসুখ। অসুখ সারাবার উপায় আমি জানি, সে ভারি শক্ত। সৌরিবান হয়তো তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ করেছে।

বিশেষ্য	বিশেষণ

৭। সর্বনাম পদ কাকে বলে। কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৮। নীচের বাক্যগুলি থেকে সর্বনাম পদ খুঁজে লেখ।

আমাদের গ্রামের নাম রতনপুর। এখানে ভালো শাকসব্জি পাওয়া যায়। এগুলো খুব টাটকা। টিংকু এই গ্রামের ছেলে। সে এবারের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে।

৯। নীচের সর্বনাম গুলিকে বাক্যে ব্যবহার কর ঃ
আমার, সে, কে, তোমরা।

১০। ক্রিয়াপদ কাকে বলে ? ক্রিয়াপদ কয় প্রকারের ?

১১। নীচের বাক্যগুলোতে উপযুক্ত ক্রিয়াপদ বসাও ঃ

(ক) ছেলে মেয়েরা গ্রীষ্মকালে ফুটবল———।

(খ) এখানে———উপযুক্ত বেশী মাঠ নেই।

(গ) তবুও অনেক বড় খেলোয়াড় হিসেবে নাম ———।

(ঘ) তারা মূলত নিজেদের চেষ্টায়ই বড়———।

১২। অব্যয়পদ কাকে বলে ? কিছু উদাহরণ দাও।

১৩। নীচের বাক্যগুলিতে ঠিক হলে √ চিহ্ন ও ভুল হলে × চিহ্ন বসাও ঃ

(ক) নাম বাচক কোন পদই হলো বিশেষ্য।

(খ) অব্যয় পদের কোন পরিবর্তন হয় না।

(গ) অর্থবোধক বিভক্তিযুক্ত শব্দই হলো পদ।

(ঘ) বিশেষ্য ও বিশেষণের পরিবর্ত শব্দই সর্বনাম।

(ঙ) বিশেষণ কেবল বিশেষ্যেরই দোষ, গুণ, ভালো, মন্দ ইত্যাদি প্রকাশ করে।

(চ) ক্রিয়াপদ ছাড়াই বাক্য হতে পারে।

(ছ) যে ক্রিয়াপদের কর্ম নেই তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যে পদের দ্বারা কোন কিছু করা, হওয়া বা থাকা বোঝায় তাকে **ক্রিয়াপদ বলে।**

এই রকম, কোন কিছু করা, হওয়া বা থাকা, বর্তমানে ঘটতে পারে অতীতে ঘটে যেতে পারে অথবা ভবিষ্যতে ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কাল অর্থই হল সময়। সময়ের এই তারতম্যের জন্য **ক্রিয়ার কালকে তিন ভাগে** ভাগ করা হয়। যেমন,

(ক) বর্তমান কাল, (খ) অতীত কাল ও (গ) ভবিষ্যৎ কাল।

(ক) বর্তমান কাল

১। পিতার আদেশ **পালন** করুন। ২। আনন্দে সে **লাফাচ্ছে।**

উপরের বাক্য দু'টিতে 'পালন' করা ও 'লাফান' কাজটি এখন অর্থাৎ বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে —সেজন্য এরা **বর্তমান কালে** ব্যবহৃত হয়েছে।

ক্রিয়ার যে কাজ এখন হচ্ছে বা এইমাত্র বর্তমানে সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ সম্পন্ন হয়, সেই কালকে বর্তমান কাল বলে।

(খ) অতীত কাল

১। গতকাল তাহারা **পৌঁছাইয়াছিল।**

২। আমরা **থাকতাম** বিহার প্রদেশে।

উপরের বাক্য দু'টি লক্ষ্য কর। গতকাল 'পেঁাছিলাম'। এখন বা ভবিষ্যতে কখন পেঁছাবে? তা কিন্তু আমরা জানিনা। আগামীকাল কখন পেঁাছাবে তাও আমাদের জানা সম্ভব নয়। তবে গতকাল অর্থাৎ অতীতে পেঁছাইয়াছিল তা আমরা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি। তেমনি আমরা অতীতে থাকতাম বিহার প্রদেশে। এই কাজগুলো অতীতে ঘটেছে বলেই এরা **অতীত কাল।**

যে ক্রিয়ার কাজ পূর্বে বা অতীতকালে শেষ হয়ে গিয়েছে বোঝায়, তার কালকে অতীতকাল বলে।

(গ) ভবিষ্যত কাল

১। এই দেশেতে জন্ম—যেন এই **দেশেতে মরি।**

২। যত উপরে উঠবে তত ঠাণ্ডা **বাড়তে থাকবে।**

উপরের বাক্য দু'টি লক্ষ্য কর। প্রথম বাক্যে, এই দেশেতে জন্ম অর্থাৎ জন্মেছি। এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু প্রার্থনা করা হচ্ছে যেন এই দেশেতে মরতে পারি। অর্থাৎ ভবিষ্যতে মরব। তেমনি দ্বিতীয় বাক্য, উপরে ওঠা হলেই ঠাণ্ডা বাড়তে থাকবে তা বুঝতে পারবো। তবে এখন তা

বোঝা যাচ্ছে না। উপরে উঠলে অর্থাৎ ভবিষ্যতে। সেইজন্যই **মরি, উঠবে** ও **বাড়তে থাকবে** এই ক্রিয়াগুলির ভবিষ্যৎ কালের রূপ হয়েছে।

যে ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যতে বা পরে হবে বা হয় তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে।

মনে রেখো ঃ

- যে সময়ে ক্রিয়া ঘটে থাকে তার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে।
- কাল অনুসারে ক্রিয়াকে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনভাগে ভাগ করা হয়।

অনুশীলনী

১। ক্রিয়ার কাল কাকে বলে ?

… … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … …

২। কাল কয় প্রকার ও কি কি ?

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

৩। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের তিনটি করে উদাহরণ দাও।

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

৪। ক্রিয়াগুলি কোনটি কোন কালের তা নীচের ছকে বসাও ঃ

বর্তমান	অতীত	ভবিষ্যত

৫। নীচের বাক্যগুলি পড় ও ক্রিয়াপদ বের করে সেগুলো প্রদত্ত ছকে সাজাও ঃ

বাক্য	ক্রিয়া	কালের নাম
(ক) ও কথা আর বলতে হবে না।		
(খ) সঙ্গে সঙ্গে মা তার যত্ন সুরু করে দেয়।		
(গ) সে তার দাদার সঙ্গে থাকতো।		
(ঘ) আমি লেখাপড়া করছি।		
(ঙ) আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম।		

৬। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি ভবিষ্যৎ কাল অনুসারে লেখ ঃ

আমরা গতকাল একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলিয়াছি। আমাদের দলের প্রায় সকলেই অংশ গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষকমহাশয়গণও উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে আমাদের খুব আনন্দ হইয়াছে। ৫

লিঙ্গ শব্দের অর্থ — **চিহ্ন** বা **লক্ষণ**। এই চিহ্ন বা লক্ষণ-এর সাহায্যেই স্ত্রী, পুরুষ অথবা স্ত্রী-পুরুষ ভিন্ন অন্য পদার্থকে বুঝা যায় বা চেনা যায়।

উপরের ছবিগুলি দেখো—

১। একটি **ছেলে** ফুটবল খেলছে।

এখানে 'ছেলে' এই শব্দটি পুরুষ-বাচক। সেজন্য 'ছেলে' শব্দটি **পুংলিঙ্গ**।

২। একটি **মেয়ে** হারমনিয়ম বাজাচ্ছে।

এখানে 'মেয়ে' শব্দটি স্ত্রী-বাচক। সেজন্য 'মেয়ে' শব্দটি **স্ত্রীলিঙ্গ**।

৩। **গাছে ফল** ধরেছে।

এখানে 'গাছ' ও 'ফল' এই শব্দ দু'টি স্ত্রী কিংবা পুরুষবাচক কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সেজন্য ঐ দু'টি শব্দই **ক্লীবলিঙ্গ**।

যার দ্বারা কোন বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের স্ত্রী, পুরুষ বা স্ত্রী-পুরুষের কোনটিই নয় তা নির্ণয় করা হয়, তাকে লিঙ্গ বলে।

লিঙ্গ চার প্রকার। যেমন—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ।

প্রাণিবাচক যে শব্দ দিয়ে পুরুষ জাতিকে বুঝায়, তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন—দাদা, বাবা, বালক, গায়ক, শিক্ষক ইত্যাদি।

প্রাণিবাচক যে শব্দ দিয়ে স্ত্রী-জাতিকে বুঝায়, তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন — মা, দিদি, দিদিমা, বালিকা, গায়িকা, শিক্ষিকা ইত্যাদি।

বস্তুবাচক যে শব্দ দিয়ে পুরুষ বা স্ত্রীজাতির কোনটিকেই বুঝায় না তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন – বাড়ী, মাঠ, বই, পেন্সিল, কলম ইত্যাদি।

যে জাতিবাচক শব্দ দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিকেই বুঝায়, তাকে উভয়লিঙ্গ বলে। যেমন — বন্ধু, সন্তান, লোক, শিশু, কবি ইত্যাদি।

বাঙলা ভাষায় অনেক সময় পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের শেষে পুংলিঙ্গ শব্দ যোগ করেও স্ত্রী অথবা পুরুষের পার্থক্য বোঝান হয়। যেমন—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বেটাছেলে	মেয়েছেলে	মদ্দা কুকুর	মাদী কুকুর
পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ	হুলো বেড়াল	মেনি বেড়াল

বাঙলা ভাষায় পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে পরিবর্তন করার কয়েকটি নিয়ম আছে। নীচে সেই নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

১। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে '**আ**'-যোগে ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
চতুর	চতুরা	বৎস	বৎসা	অনাথ	অনাথা
চপল	চপলা	মহাশয়	মহাশয়া	নবীন	নবীনা
শিষ্য	শিষ্যা	মাননীয়	মাননীয়া	সরল	সরলা
কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা	পূজনীয়	পূজনীয়া	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা

২। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে '**অক্**' থাকলে '**ইক্**' যোগে করার পরে আ-যোগে স্ত্রীলিঙ্গ ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গায়ক	গায়িকা	বালক	বালিকা
লেখক	লেখিকা	পাচক	পাচিকা
পাঠক	পাঠিকা	নায়ক	নায়িকা

৩। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে '**ঈ**'-কার যোগে ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দেব	দেবী	চণ্ডাল	চণ্ডালী	পিতামহ	পিতামহী
ছাত্র	ছাত্রী	নদ	নদী	অভিনেতা	অভিনেত্রী
হংস	হংসী	ধাতা	ধাত্রী	সহচর	সহচরী

৪। চলিত ভাষায় বাংলা পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'ঈ'-কার যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয় ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কাকা	কাকী	ভেড়া	ভেড়ী	পাগল	পাগলী
খোকা	খুকী	বেটা	বেটী	মোরগ	মুরগী
বুড়ো	বুড়ী	ময়ূর	ময়ূরী	মামা	মামী

৫। 'নী' প্রত্যয় যোগে ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মালী	মালিনী	নাতি	নাতনী	গয়লা	গয়লানী
ধোপা	ধোপানী	কামার	কামারনী	ডোম	ডোমনী

৬। 'ইনী' প্রত্যয় যোগে ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাঘ	বাঘিনী	সাপ	সাপিনী
গোয়ালা	গোয়ালিনী	কাঙাল	কাঙালিনী

৭। 'আনী' প্রত্যয় যোগে ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী	শিব	শিবানী
ভব	ভবানী	মাতুল	মাতুলানী

৮। ভিন্ন শব্দ যোগে ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ছেলে	মেয়ে	রাজা	রানী	জনক	জননী
পুত্র	কন্যা	বাদশা	বেগম	ভ্রাতা	ভগ্নী
ভাই	বোন	চাকর	ঝি	দাদু	দিদিমা
পিতা	মাতা	বর	বধূ	ঠাকুরদা	ঠাকুরমা

কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ আছে যাদের স্ত্রীলিঙ্গ নেই। এরা নিত্য পুংলিঙ্গ। যেমন—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, কৃতদার, বিপত্নীক ইত্যাদি।

আবার কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আছে যাদের পুংলিঙ্গ নেই। এরা নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন—সতীন, লক্ষ্মী, পৃথিবী ইত্যাদি।

মনে রেখো

- যে চিহ্ন দ্বারা পুরুষ, স্ত্রী বা অন্য কোন বস্তু বোঝা যায় তাকে লিঙ্গ বলে।
- লিঙ্গ চার প্রকার —পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ আর উভয়লিঙ্গ।

অনুশীলনী

১। লিঙ্গ কয় প্রকার ও কি কি ? দু'টি করে উদাহরণ দাও।

... ...

... ...

... ...

... ...

২। 'ঈ' যোগে, 'আনী' যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের তিনটি করে উদাহরণ দাও।

... ...

... ...

... ...

... ...

৩। নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

....

... ...

... ...

... ...

৪। অশুদ্ধ শোধন করে পুনরায় লেখ ঃ

সরস্বতী আমাদের দেবতা। রীনা দেখতে সুন্দর। হেমন্ত মুখার্জী গায়িকা।

... ...

... ...

... ...

... ...

৫। নীচের শব্দগুলি লিঙ্গ অনুসারে ছকে সাজাও ঃ

মা, শিশু বাছুর, বুড়ী, রানী, সিংহ, মানুষ, তরুণ, কিশোর, রাজা, গাছ, পাথর পর্বত, নদী, লতা, সন্তান, বিপত্নীক, ননদ, ললনা, রূপসী।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	উভয়লিঙ্গ

১. আমি ভারত সম্রাট।

২. **তোমরা** পশ্চিমবঙ্গের জনগণ।

প্রথম বাক্যে 'আমি' একজন মাত্র ব্যক্তি আর **দ্বিতীয়** বাক্যে 'তোমরা' বহুমানুষের উদাহরণ। এখানে 'আমি' **একবচন** কিন্তু 'তোমরা' **বহুবচন**।

যার দ্বারা বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের সংখ্যা সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি, তাকে বচন বলে।
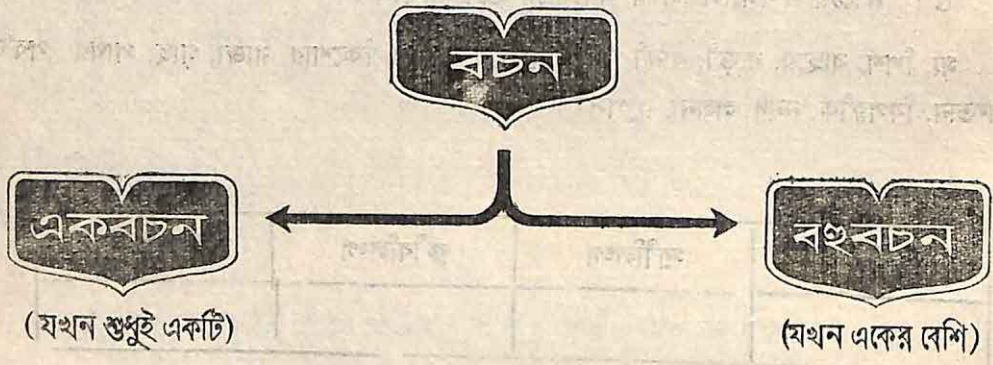
বচন দু'প্রকার—

(ক) **একবচন ও**

(খ) **বহুবচন।**

(ক) **যে শব্দ দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর একটিমাত্র সংখ্যা নির্দেশ করা হয়, তাকেই একবচন বলে।** যেমন - শিশু, পাখি, কলম, মানুষ, আমি, তুমি প্রভৃতি।

(খ) **যে শব্দ দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর একাধিক সংখ্যা নির্দেশ করা হয়, তাকে বহুবচন বলে।** যেমন—আমরা, তোমরা, বৃক্ষসকল, ছাত্রগণ, বইগুলি প্রভৃতি।

৩। অনেক সময় **একই বিশেষ্য পদ** বা **বিশেষণ পদ দু'বার ব্যবহার করেও** বহুবচন করা চলে। যেমন —ঝুড়ি ঝুড়ি পেয়ারা, ভারা ভারা ধান, ছোট ছোট কথা, বড় বড় বানর, শত শত টাকা।

৪। অনেক সময় **একই সর্বনাম পদ ব্যবহার করেও** বহুবচন করা হয়। যেমন—কে কে এসেছে, কার কার পড়া হয়েছে, যে যে যাবে তৈরী হও, মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর।

একবচন শব্দকে বহুবচন করার নিয়ম ঃ

১। একবচন শব্দের শেষে **-রা, -এরা, -গুলি (গুলো), -গণ, বৃন্দ, -রাশি, -সমূহ, -মণ্ডলী, -পুঞ্জ** প্রভৃতি যোগ করে বহুবচন শব্দ তৈরি হয়। যেমন—ছেলেরা, বালকেরা, শিক্ষকগণ, গরুগুলি, নক্ষত্রমণ্ডলী, মেঘপুঞ্জ, বিদ্যালয়সমূহ, নেতৃবৃন্দ ইত্যাদি।

২। বিশেষ্য পদের আগে **সংখ্যাবাচক বিশেষ্য বসিয়ে** বহুবচন করা যায়। যেমন শতপুত্র, বিস্তর টাকা, পঞ্চকন্যা, পঞ্চনদ, অষ্টবসু, নবগ্রহ, দশদিক ইত্যাদি।

মনে রেখো—

- যার দ্বারা বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা করা যায় তাকে বচন বলে।
- বচন দুপ্রকার একবচন ও বহুবচন।
- একবচনকে নানাভাবে বহুবচনে পরিণত করা যায়।

অনুশীলনী

১। বচন কাকে বলে ? বচন কয় প্রকার ?

... ...

... ...

... ...

... ...

২। বালিকা, তুমি, শ্রমিক, গরু—এই শব্দগুলিকে বহুবচনে পরিণত কর।

... ...

... ...

... ...

... ...

৩। নীচের শব্দগুলি বচন অনুসারে ঠিক ঠিক ঘরে বসাও ঃ
টাকাটা, একশটাকা, গাছ, গ্রহ, শতভাই, বারমাস, কাঁচা কাঁচা আম, ছাত্রগণ, শিক্ষক, কেশরাশি, আমি, আমরা।

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন

৪। পরপর দু'বার বিশেষ্যপদ বসিয়ে বহুবচনের উদাহরণ।

... ...

... ...

... ...

... ...

৫। কোনটি একবচন ও কোনটি বহুবচন লেখ ঃ

(ক) তাহারা খেলাধুলা করে। ... ...

(খ) তরুণদল দেশের ভবিষ্যৎ। ... ...

(গ) রাশি রাশি ফুল ফুটিয়াছে। ... ...

(ঘ) সৈন্যদল পাহারা দেয়। ... ...

(ঙ) আমি তাহাদের শত্রু। ... ...

১। আমি রাজপুত্র।

২। তোমরা আমার প্রজা।

৩। মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্রমিত্র সকলেই রাজার অধীন।

উপরের বাক্যগুলিতে আমি, তোমরা, মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্রমিত্র সমস্ত শব্দগুলিই পুরুষের উদাহরণ।

ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষভাবে বুঝাবার জন্য যে-সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাদের পুরুষ বলে।

পুরুষ তিন প্রকার—

(ক) **উত্তম পুরুষ,** (খ) **মধ্যম পুরুষ ও** (গ) **প্রথম পুরুষ।**
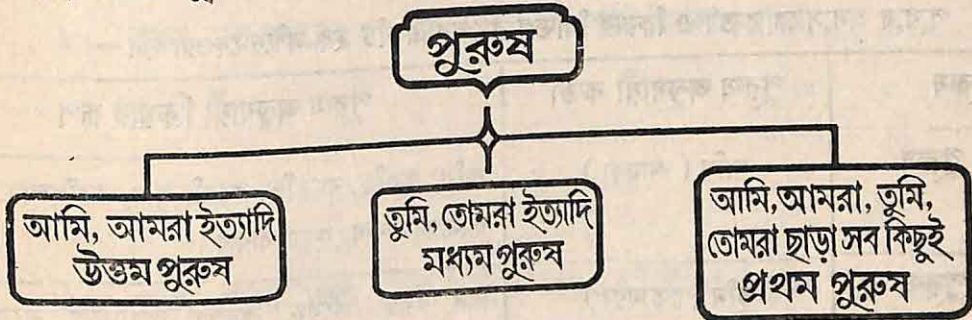
(ক) উত্তম পুরুষ

তার উন্নতির কারণ **আমি** জানি। কে জানে? আমি জানি। অর্থাৎ বক্তা নিজেই জানে। বক্তা 'আমি' **উত্তম পুরুষ।**

ক্রিয়ায় যখন বক্তা নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলে, তখন সে হয় উত্তম পুরুষ। যেমন—আমি, আমরা, আমাদিগকে প্রভৃতি।

(খ) মধ্যম পুরুষ

তোমরা কি খেলতে পারবে?

এই বাক্যে জানতে চাওয়া হয়েছে—তোমরা কি খেলতে পারবে? তোমাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—**সেজন্য 'তোমরা' মধ্যম পুরুষ।**

বাক্যের অন্তর্গত যে পদকে উদ্দেশ্য বা আহ্বান করে কিছু বলা হয় তার মধ্যমপুরুষ হয়। যেমন – তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনাদের, তুই, তোরা, তোকে প্রভৃতি।

(গ) **প্রথম পুরুষ**

মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, পাত্রমিত্র সবাই রাজার সভাসদ।

এই বাক্যের **মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, পাত্রমিত্র,** প্রত্যেকেই প্রথম পুরুষ। আমি, আমরা, তুমি, তোমরা ভিন্ন সকল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদই প্রথম পুরুষ।

উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদই প্রথম পুরুষ।

যেমন—সে, তাহারা, তিনি, তাহাদিগকে, উনি, এঁরা, বোন, গান, রাম, শ্যাম, যদু, মধু, রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, ভায়েরা, বোনেরা, ছাত্র, ছাত্ররা, শিক্ষকগণ প্রভৃতি।

পুরুষ অনুসারে কর্তা ও ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের একটি ছক নীচে দেওয়া হল—

পুরুষ	পুরুষ অনুযায়ী কর্তা	পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ
উত্তম পুরুষ	আমি (আমরা)	করি, করছি, করেছি, করেছিলাম, করছিলাম, করব, করতে থাকব, করে থাকব।
মধ্যম পুরুষ	তুমি (তোমরা)	কর, করছ, করেছ, করলে, করছিলে, করেছিলে, করবে, করতে থাকবে, করে থাকবে।
	তুই (তোরা)	কর, করছিস্, করেছিস, করছিলি, করেছিলি, করবি, করলি, করতে থাকবি, করে থাকবি।
	আপনি (আপনারা)	করেন, করছেন, করেছেন, করলেন, করছিলেন, করে-ছিলেন, করবেন, করতে থাকবেন, করে থাকবে।
প্রথম পুরুষ	সে (তারা) রাম (রামেরা)	করে, করছে, করেছে, করছিল, করেছিল, করবে, করতে থাকবে।
	তিনি (তাঁরা) রামবাবু (রামবাবুরা)	করেন, করছেন, করেছেন, করলেন, করছিলেন, করে-ছিলেন, করতে থাকবেন, করে থাকবেন।

মনে রেখো

- ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষ ভাবে বোঝাবার জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে পুরুষ বলে।
- পুরুষ তিন প্রকার – উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ।

অনুশীলনী

১। বাংলা ব্যাকরণে পুরুষ বলতে কী বোঝায়?

... ...

... ...

... ...

... ...

২। পুরুষ কত রকমের? প্রত্যেকের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

... ...

... ...

... ...

... ...

৩। প্রথম পুরুষ বললে কী বোঝা যাবে? উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের পার্থক্য কী?

... ...

... ...

... ...

... ...

৪। নীচেরগুলি ঠিক করে লেখ:

(ক) উত্তম পুরুষ হলো—আমি, তুমি, তুই, আপনি শব্দ থেকে তৈরী সর্বনাম পদ ছাড়া আর সমস্ত সর্বনাম পদ এবং বিশেষ্য পদ।

(খ) আমি শব্দ থেকে তৈরী সব রকম সর্বনাম পদই প্রথম পুরুষ।

৫। নীচের বাক্যগুলিতে মোটা হরফের যে শব্দ আছে সেগুলির সঠিক উত্তরটির উপর দাগ দাও ঃ

(ক) **আমরা** দেশে বাস করি। প্রথম পুরুষ / উত্তম পুরুষ।

(খ) চোরটাকে **ওরা** মারল। উত্তম পুরুষ / প্রথম পুরুষ।

(গ) **তোরা** সব কাপুরুষ। উত্তম পুরুষ / মধ্যম পুরুষ।

(ঘ) **গুরু** শিক্ষাদাতা। মধ্যম পুরুষ / প্রথম পুরুষ।

৬। উত্তম পুরুষের বাক্যানুসারে পুরুষগুলির রূপ লেখ ঃ

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
(ক) আমি মাছ খাই	....	....
(খ) আমরা খেলা করি	....	....
(গ) আমি ক্রিকেট খেলি	....	....
(ঘ) আমরা বিদ্যালয়ে যাই	....	....

৭। বন্ধনীর মধ্যের শব্দ থেকে সঠিক পুরুষবাচক শব্দটি শূন্যস্থানে বসাও ঃ

(ক) .... মধ্য কলকাতায় বাস করতেন (তোমরা / তাঁরা / তারা)

(খ) পিতার তিরস্কার............মাথা পেতে নিলাম (সে / তিনি / আমি)

(গ) ....এত চেঁচাচ্ছ কেন ? (সে / তুমি / আমি)

ণত্ব বিধান

বাংলায় ণ-এর উচ্চারণ কম। বিদেশী শব্দের বানানে ন লেখাই ভাল। কিন্তু সংস্কৃত থেকে যে শব্দ পরিবর্তিত না হয়ে বাংলায় এসেছে সেখানে ণ ও ন ব্যবহারের নিয়ম আছে।

যে নিয়ম বা বিধানে ণ ও ন ব্যবহারের সুস্পষ্ট নির্দেশ সূচীত হয় তাকে ণত্ব বিধান বলে।

ণত্ব বিধানের নিয়ম ঃ

১। ঋ, র্, ষ্, এই কয়টি বর্ণের পরস্থিত 'ন্' মূর্ধন্য 'ণ' হয়।

যেমন ঋণ, তৃণ, ঘৃণা। বর্ণ, কর্ণ, পূর্ণ। বিষ্ণু, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা।

২। যদি দুইটি পদ মিলে একটি শব্দ হয় এবং একপদে ঋ, র, ষ্ থাকে, এবং অন্য পদে '**ন**' থাকে, তাহলে '**ন**' মূর্ধন্য '**ণ**' হয় না। যেমন –

হরি + নাম = হরিনাম,

দুর + নাম = দুর্নাম,

ত্রি + নেত্র = ত্রিনেত্র,

বৃষ + যান = বৃষযান ইত্যাদি।

কিন্তু সূর্প + নখা = সূর্পণখা, এখানে ব্যক্তিবিশেষের নাম একপদরূপে বিবেচিত হয়েছে, তাই '**ণ**' হল।

৩। ঋ, র, ষ এই তিনবর্ণের পরে স্বরবর্ণের, **ক বর্গ** (ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্), **প বর্গ** (প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্) এবং অন্তঃস্থ য্, ব্, হ্ এবং অনুস্বার থাকলে পরবর্তী 'ন্' 'ণ'-তে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

যেমন

পাষাণ, রুক্মিণী, অর্পণ,

প্রয়াণ, শ্রবণ, নির্বাণ ইত্যাদি।

৪। উপরিউক্ত বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ ব্যবধান থাকলে '**ন্**' মূর্ধন্য '**ণ**' হয় না। যেমন—

অর্চনা, প্রার্থনা, বিসর্জন।

অর্জুন, রচনা, বর্ধন।

৫। সম্বোধন পদের অন্তেস্থিত '**ন**' মূর্ধন্য '**ণ**' হয় না। যেমন—

শ্রীমান্, ব্রাহ্মন্।

৬। দন্ত্য '**ন**' যদি '**ত্**' বর্গ যুক্ত হয় তবে তার পরিবর্তন হয় না। যেমন – বৃন্দ, বৃন্ত।

৭। 'ট' বর্গের পূর্বের দন্ত্য 'ন' স্বভাবতঃই মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—কণ্ঠ, বণ্টন।

৮। প্র, পরি, নির, এই তিনটি উপসর্গের পর নদ্, নম্, নস্, নী, নুদ, নু, হন ধাতুর দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—

প্রণাম, পরিণাম, প্রণাশ,
নির্ণয়, প্রণিপাত ইত্যাদি।

৯। প্র, পরা, পূর্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরবর্তী অহ্ন শব্দে 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—

প্রাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।
কিন্তু মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, আহ্নিক ইতাদি।

১০। পর, পরি, উত্তর, চান্দ্র, নার, রাম শব্দের পর **অয়ন্** শব্দ থাকলে, অয়ন শব্দের দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—পরায়ণ, নারায়ণ, উত্তরায়ণ,
চান্দ্রায়ণ, রামায়ণ ইত্যাদি।

১১। কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃই মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন—

আপণ	কল্যাণ	কোণ	ফণা	বেণু
কঙ্কণ	লবণ	গুণ	বাণী	পণ
বাণিজ্য	নিপুণ	গণ্য	ঘৃণ	পণ্য
কণিকা	বণিক	মণি	গৌণ	গণ
লাবণ্য	চাণক্য	বাণ	ফণী	কণা

ব্যতিক্রম ঃ

১২। (ক) বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয় না। যেমন—
করেন, পারেন, বলেন, ধরেন ইত্যাদি।

(খ) তদ্ভব অর্থাৎ সংস্কৃত হতে আগত কিন্তু দেশী ভাবে উচ্চারিত শব্দ সর্বদাই 'ন' হবে। যেমন—
সোনা (স্বর্ণ), কান (কর্ণ),
বামুন (ব্রাহ্মণ) কিন্তু রাণী, রানী দুই-ই হতে পারে।

(হ) বিদেশী শব্দের পরিস্থিত দন্ত্য 'ন' সর্বদাই দন্ত্য 'ন' হবে।
যেমন—জার্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি।

ষত্ব বিধান

বাংলা বানানে 'ষ' ব্যবহারের নিয়মকে ষত্ববিধান বলে ঃ ষত্ববিধানের নিয়ম ঃ

১। অ, আ, ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক, র এই সকল বর্ণের পর 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন—
জিগীষা, ভবিষ্যৎ, মুমুক্ষু, মুমূর্ষু ইত্যাদি।

২। উপসর্গের পর ইকার এবং উকারের পর কতকগুলি ধাতুর 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন - অনুষ্ঠান, অভিষেক, নিষেধ, নিষিদ্ধ ইত্যাদি।
কিন্তু অনুসন্ধান, অনুস্বার বা বিসর্গের 'স', 'ষ' হয় না।

৩। ঋকারের পরে সবসময়েই মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন — ঋষি, কৃষ্ণ ইত্যাদি।

৪। দুইটি পৃথক পৃথক পদে একটি শব্দ গঠিত হলে, এবং প্রথম পদের শেষে ই, উ, ঋ ও পরবর্তী পদের প্রথম 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন —
মাতৃ + স্বসা = মাতৃষ্বসা ; সু + সম = সুষম ইত্যাদি।

৫। কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃই মূর্ধন্য 'ষ' ব্যববহৃত হয়। যেমন —

ঔষধ	বিষয়	তুষার
মহিষ	আষাঢ়	ভাষা
ভূষণ	রোষ	পৌষ
ঈষৎ	পুরুষ	শিষ্য

৬। (ক) মূল সংস্কৃত শব্দ থেকে আগত তদ্ভব শব্দে 'শ', 'ষ' বা 'স'-এর কোনরকম পরিবর্তন হয় না। যেমন আঁশ (অংশু), পোষ্য (পোষণ)।

(খ) বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণ অনুসারে 'S'-এর স্থানে দন্ত্য 'স' এবং 'Sh'-এর স্থানে তালব্য 'শ' হয়। যেমন -
গ্লাস, গেলাস, শাল, স্কুল, ইত্যাদি।

(গ) ইংরেজি St-এর স্থানে বাংলা 'স্ট' লেখাই উচিত। যেমন —
মাস্টার, আগস্ট, স্টোর্স, স্টেটব্যাঙ্ক, স্টার, ইনস্টীটিউশন্।

৭। কতকগুলি শব্দে সবসময়ে 'ষ' হয়। যেমন—
ঔষধ, নিকষ, বিষ, গণ্ডূষ, ষোড়শ,
ঈষৎ, মহিষ, কোষ, সর্ষপ, ঘর্ষণ,
পাষাণ, তুষার, ভাষা, কর্ষিত, কর্ষণ,
কষায়, পাষণ্ড, পুষ্প, প্রত্যুষ, ভাষণ।
আষাঢ়, বিশেষ, ঊষা, মূর্ষিক, ভীষণ,
প্রদোষ, ঊষর, দোষ, পুরুষ, বিষয়,

ন রেখো —
যে বিধানে বাংলা বানানে 'ণ' ও 'ন'র ব্যবহার নির্দিষ্ট তাকে ণত্ব বিধান বলে।

- যে বিধানে বাংলা বানানে 'ষ' এর ব্যবহার নির্দিষ্ট তাকে 'ষ'ত্ব বিধান বলে।
- বিদেশী শব্দে 'ষ' ব্যবহার হয় না।

অনুশলনী

১। ণত্ববিধান কাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

২। ষত্ব বিধান কাকে বলে?

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

৩। শুদ্ধ করে লেখ ঃ

বাতাশ, ষীত, দক্ষিন, ছানা, জিনিষ, দ্রোন, শিষ্যগন, ণন্দনে, প্রান, পোষাক, কঠিন, রাক্ষস, কেমণ, পুলিশ, নোটিশ, সহর, সাবান, খরগোস, নালিস, খুসী, খ্রীস্ট, ক্রাইষ্ট, খৃস্টাব্দ।

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … …

৪। শুদ্ধ বানানটির পাশে ✓ দাগ দাও।

হরিন ……… । তৃণ ……… । পূর্ণিমা ……… । অপরাহ্ন ……… । রামায়ণ ……… ।

হরিণ ……… । তৃন ……… । পূর্ণিমা ……… । অপরাহ্ণ ……… । রামায়ন ……… ।

পরিবহণ ……… । বেনু ……… । কল্যাণ ……… । লবণ ……… । পূর্বাহ্ণ ……… ।

পরিবহন ……… । বেণু ……… । কল্যান ……… । লবন ……… । পূর্বাহ্ন ……… ।

স্মরণ ……… । দক্ষিণ ……… । লাবন্য ……… । পণ ……… । বীনা ……… ।

স্মরন ……… । দক্ষিন ……… । লাবণ্য ……… । পন ……… । বীণা ……… ।

বাষ্প ……… । পরিস্কার ……… । পুরস্কার ……… । ষ্টেশন ……… । কল্যাণীয়াসু ……… ।

বাস্প ……… । পরিষ্কার ……… । পুরষ্কার ……… । স্টেশন ……… । কল্যাণীয়াষু ……… ।

পূজনীয়েসু ……… । স্টেট ……… । পৌষ ……… । আসাঢ় ……… । ভূষন ……… ।

পূজনীয়েষু ……… । ষ্টেট ……… । পৌস ……… । আষাঢ় ……… । ভূষণ ……… ।

৫। বাংলা শব্দে 'র' এর পর কোথায় দন্ত্য 'ন' ব্যবহার হয় ?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

সাধু ও চলতি ভাষার বাংলা শব্দের ধ্বনি ভিন্ন ভিন্ন। ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনি। কখনও কখনও সন্নিহিত দুই বর্গের মিলন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ একটি উচ্চারণে পরিণত হয়। এই মিলনই হল **সন্ধি**। সন্ধিযুক্ত শব্দ ব্যবহারে ভাষা সুন্দর ও শ্রুতিমধুর হয়।

বাংলা ব্যাকরণে পাশাপাশি দু'টি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।

সন্ধি দু'প্রকারের—

(ক) স্বরসন্ধি ও (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরসন্ধি

একমাত্র স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনের ফলে যে সন্ধি হয় তাকেই স্বরসন্ধি বলে।

যেমন — রবি (ই) + (ই) ইন্দ্র = রবীন্দ্র

নব (অ) + (অ) অন্ন = নবান্ন

এখানে স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনের ফলে সন্ধি হয়েছে বলে এরা স্বরসন্ধি।

স্বরসন্ধির নিয়ম ঃ

অ + অ = আ ঃ

শক + অব্দ = শকাব্দ।

যুগ + অন্তর = যুগান্তর।

পর + অন্ন = পরান্ন।

অন্য + অন্য = অন্যান্য।

স্ব + অবলম্বন = স্বাবলম্বন।

স্ব + অধীন = স্বাধীন।

স্ব + অর্থ = স্বার্থ।

স্ব + অবলম্বী = স্বাবলম্বী।

আ + অ = আ ঃ

ভিক্ষা + অন্ন = ভিক্ষান্ন।

আশা + অতীত = আশাতীত।

অ + আ = আ ঃ

হিম + আলয় = হিমালয়।

দেব + আলয় = দেবালয়।

জীব + আত্মা = জীবাত্মা।

পরম + আনন্দ = পরমানন্দ।

বিবেক + আনন্দ = বিবেকানন্দ।

নব + আগত = নবাগত।

ফল + আহার = ফলাহার।

সিংহ + আসন = সিংহাসন।

আ + আ = আ ঃ

মহা + আশয় = মহাশয়।

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

যথা + অর্থ = যথার্থ।
কথা + অমৃত = কথামৃত।
সেনা + অধ্যক্ষ = সেনাধ্যক্ষ।
মহা + অর্ঘ্য = মহার্ঘ্য।
মহা + অরণ্য = মহারণ্য।

সদা + আনন্দ = সদানন্দ।
ক্ষুধা + আতুর = ক্ষুধাতুর।
কশা + আঘাত = কশাঘাত।
মহা + আহব = মহাহব।
মহা + আনন্দ = মহানন্দ।

২। ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয়। ঐ ঈ-কার আগের বর্ণের সাথে যোগ হয়। যেমন ঃ

ই + ই = ঈ ঃ

অতি + ইব = অতীব।
অতি + ইত = অতীত।
মণি + ইন্দ্র = মণীন্দ্র।
মুনি + ইন্দ্র = মুনীন্দ্র।
অভি + ইস্ট = অভীষ্ট।

ঈ + ই = ঈ ঃ

সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র।
শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র।
মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র।
বলী + ইন্দ্র = বলীন্দ্র।
ফণী + ইন্দ্র = ফণীন্দ্র।

ই + ঈ = ঈ ঃ

গিরি + ঈশ = গিরীশ।
পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।
ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ।
অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর।
প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা।

ঈ + ঈ = ঈ ঃ

যোগী + ঈশ্বর = যোগীশ্বর।
শ্রী + ঈশ = শ্রীশ।
শচী + ঈশ = শচীশ।
সতী + ঈশ = সতীশ।
দিল্লী + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর।

৩। উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। ঐ ঊ-কার আগের বর্ণের সাথে যোগ হয়। যেমন,

উ + উ = ঊ ঃ

অনু + উদিত = অনূদিত
কটু + উক্তি = কটূক্তি
মরু + উদ্যান = মরূদ্যান
মধু + উৎসব = মধূৎসব
গুরু + উপদেশ = গুরূপদেশ

ঊ + উ = ঊ ঃ

বধূ + উক্তি = বধূক্তি
বধূ + উৎসব = বধূৎসব
ভূ + উৎক্ষেপ = ভূৎক্ষেপ

উ + ঊ = ঊ ঃ

লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি
তরু + ঊর্ধ্ব = তরূর্ধ্ব
বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব

ঊ + ঊ = ঊ ঃ

সরযূ + ঊর্মি = সরযূর্মি
ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব

৪। **অ**-কার বা **আ**-কারের পর **ই**-কার বা **ঈ**-কার থাকলে উভয়ে মিলে **এ**-কার হয়, ঐ **এ**-কার আগের বর্ণের সাথে যোগ হয়। যেমন,

অ + ই = **এ** ঃ
দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র
নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র
পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু
শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

অ + ঈ = **এ** ঃ
গণ + ঈশ = গণেশ
ভব + ঈশ = ভবেশ
পরম + ঈশ্বর = পরমেশ্বর

৫। **অ**-কার বা **আ**-কারের পর **উ**-কার বা **ঊ**-কার থাকলে উভয়ে মিলে **ও**-কার হয়। ঐ **ও**-কার আগের বর্ণের সাথে যোগ হয়। যেমন,

অ + উ = **ও** ঃ
শীত + উষ্ণ = শীতোষ্ণ
চন্দ্র + উদয় = চন্দ্রোদয়
পর + উপকার = পরোপকার
পাদ + উদক = পাদোদক

অ + ঊ = **ও** ঃ
প্রবল + ঊর্মি = প্রবলোর্মি
চল + ঊর্মি = চলোর্মি
নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া
গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব

অ + উ = **ও** ঃ
মহা + উচ্চ + মহোচ্চ
বিদ্যা + উদয় = বিদ্যোদয়
মহা + উৎসব = মহোৎসব
দুর্গা + উৎসব = দুর্গোৎসব

আ + ঊ = **ও** ঃ
মহা + ঊর্মি = মহোর্মি
গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

৬। **অ**-কার বা **আ**-কারের পর **ঋ** থাকলে সেই **ঋ অর্** হয়ে যায়, **অ** আগের বর্ণের সাথে যোগ হয় এবং **র** রেফ্ হয়ে বর্ণের মাথায় বসে। যেমন,

অ + ঋ = **অর্** ঃ
দেব + ঋষি = দেবর্ষি
উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ
সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি
অধম + ঋণ = অধমর্ণ

আ + ঋ = **অর্** ঃ
মহা + ঋষি = মহর্ষি
রাজা + ঋষি = রাজর্ষি

[কাতর অর্থে 'ঋত' পরে থাকলে 'অর্' না হয়ে 'আর্' হয়। যেমন – শীত + ঋত = শীতার্ত, তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত। **]**

৭। **অ**-কার বা **আ**-কারের পর **এ**-কার বা **ঐ**-কার থাকলে উভয় মিলে **ঐ**-কার হয়ে আগের বর্ণের সাথে মিলে যায়। যেমন,

অ + এ = **ঐ** ঃ
জন + এক = জনৈক
শুভ + এষী = শুভৈষী

অ + ঐ = **ঐ** ঃ
মত + ঐক্য = মতৈক্য
রাজ + ঐশ্বর্য = রাজৈশ্বর্য

আ + এ = **ঐ** ঃ
সদা + এব = সদৈব
তদা + এব = তদৈব

আ + ঐ = **ঐ** ঃ
মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য
মহা + ঐরাবত = মহৈরাবত

৮। **অ**-কার বা **আ**-কারের পর **ও**-কার বা **ঐ**-কার থাকলে উভয়ে মিলে **ঔ**-কার হয়, ঐ **ঔ**-কার আগের বর্ণের সাথে মিশে যায়। যেমন,

অ + ও = **ঔ** ঃ
বন + ঔষধি = বনৌষধি
জল + ওকা = জলৌকা

আ + ও = **ঔ** ঃ
মহা + ঔষধি = মহৌষধি

অ + ঔ = **ঔ** ঃ
চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য
পরম + ঔষধ = পরমৌষধ

আ + ঔ = **ঔ** ঃ
মহা + ঔষধ = মহৌষধ
মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য

৯। স্বরবর্ণ পরে থাকলে **এ** স্থানে **অয়্**, ঐ স্থানে **আয়্**, **ও** স্থানে **অব্**, **ঔ** স্থানে **আব্** হয়। **অ** ও **আ** আগের বর্ণে এবং **য়্**, ও **ব্** পরের সাথে মিলে যায়। যেমন,

এ + অ = **অয়** ঃ
নে + অন = নয়ন
শে + অন = শয়ন

ঐ + অ = **আয়** ঃ
নৈ + অক = নায়ক
গৈ + অক = গায়ক

ঔ + ই = **আবি** ঃ
নৌ + ইক = নাবিক

ও + **অ** = **অব** ঃ
পো + অন = পবন
ভো + অন = ভবন

ঔ + **অ** = **আব্** ঃ
স্তৌ + অক = স্তাবক
পৌ + অক = পাবক

ঔ + **উ** = **আবু** ঃ
ভৌ + উক = ভাবুক

১০। ই-কার বা ঈ-কারের পরে **ই-ঈ** ভিন্ন অন্য কোন স্বরবর্ণ থাকলে **ই-ঈ**-কারের জায়গায় **য্** হয়। এই **য** য-ফলা (্য) হয়ে আগের বর্ণে মিলে যায়। যেমন,

ই + **অ** = **য** ঃ
প্রতি + অহ = প্রত্যহ
বি + অর্থ = ব্যর্থ

ই + **আ** = **যা** ঃ
ইতি + আদি = ইত্যাদি
অতি + আচার = অত্যাচার

ই + **ই** = **যু** ঃ
উপরি + উপরি = উপর্যুপরি

যদি + অপি = যদ্যপি প্রতি + আশা = প্রত্যাশা
অতি + অন্ত = অত্যন্ত

ই + উ = যু :
অতি + উচ্চ = অত্যুচ্চ

ই + ঊ = যূ :
প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ
নি + ঊন = ন্যূন

ই + এ = যে :
প্রতি + এক = প্রত্যেক

ই + ঐ = যৈ :
অতি + ঐশ্বর্য = অত্যৈশ্বর্য

ঈ + অ = য:
নদী + অম্বু = নদ্যম্বু

ঈ + আ = যা :
মসী + আধার = মস্যাধার

১১। **উ**, ঊ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকলে **ই**, ঈ-এর জায়গায় **ব্** হয়। ব্ আগের বর্ণে ও পরের স্বর **ব্**-কারের সাথে যোগ হয়। যেমন,

উ + অ = ব :
সু + অল্প = স্বল্প
মনু + অন্তর = মন্বন্তর

উ + আ = বা :
সু + আগত = স্বাগত
বহু + আরম্ভ = বহ্বারম্ভ

উ + ই = বি :
অনু + ইত = অন্বিত
অনু + ইষ্ট = অন্বিষ্ট

উ + ঈ = বি :
অনু + ঈক্ষণ = অন্বীক্ষণ
সাধু + ঈ = সাধ্বী

উ + এ = বে :
অনু + এষা = অন্বেষা
অনু + এষণ = অন্বেষণ

ঊ + আ = বা :
বধূ + আগমন = বধ্বাগমন
বধূ + আসন = বধ্বাসন

বাংলায় কতকগুলো সন্ধি আছে যারা ব্যাকরণের কোন সূত্রই মেনে চলে না। **এসব সন্ধিকে নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে।** সূত্র না মানলেও এরা মোটেই অশুদ্ধ নয় আর এদের দিয়ে যে পদ তৈরি হয় তারাও শুদ্ধ। ব্যাকরণ এ-সমস্ত সন্ধিকে পুরোপুরি মেনে নিয়েছে। স্বরসন্ধির নিয়ম না মেনে যে সন্ধি হয় তাকে নিপাতনে সিদ্ধ **স্বরসন্ধি** বলে। এই রকম সন্ধির কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। যেমন,

সীম + অন্ত = সীমন্ত
গো + অক্ষ = গবাক্ষ
কুল + অটা = কুলটা
প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়
গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র
বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ

[এই সব সন্ধির কোনটাই সন্ধির সূত্র হিসেবে হয়নি। বাংলায় এরকম অনেক শব্দ তোমরা পাবে।]

ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন,

জগৎ (ত) + (ঈ) দীশ = জগদীশ

এখানে ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণ মিলিত হয়ে ব্যঞ্জনসন্ধি হয়েছে।

ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম ঃ

১। **ত্** ও **দ্**-এর পরে **চ্** বা **ছ্** থাকলে **ত** ও **দ্**-এর জায়গায় **চ্** হয়। যেমন, চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র ; শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র ; উ + চ্ছেদ = উচ্ছেদ ; বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা ; তদ্ + ছবি = তচ্ছবি।

২। **ত্**, ও **দ্**-এর পর **জ্** বা **ঝ্** থাকলে **ত্** ও **দ্**-এর জায়গায় **জ্** হয়। যেমন, উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল ; সৎ + জন = সজ্জন , বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল।

৩। **ত্**, **দ্** বা **ধ্**-এর পরে **ণ্** বা **ম্** থাকলে সেই জায়গায় **ন্** হয়। যেমন, বিপদ্ + মুক্তি = বিপন্মুক্তি ; মৃৎ + ময় = মৃন্ময় ; তৎ + নিমিত্ত = তন্নিমিত্ত ; ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি ; দিক্ + নাগ = দিঙ্ নাগ।

৪। **ল্** পরে থাকলে **ত্** ও **দ্**-এর জায়গায় **ল্ল্** হয়। যেমন, উৎ + লাস = উল্লাস ; উৎ + লেখ = উল্লেখ ; তদ্ + লিখিত = তল্লিখিত।

৫। বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ বা **স্** পরে থাকলে বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের জায়গায় প্রথম বর্ণ হয়। যেমন, হৃৎ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড ; হৃৎ + কম্প = হৃৎকম্প ; তদ্ + পর = তৎপর , খুদ্ + পিপাসা = খুৎপিপাসা ; তৎ + সম = তৎসম।

৬। বর্গের প্রথম বর্ণের জায়গায় তৃতীয় বর্ণ হবে তখন যখন বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ বা **য়**, **র**, **ল**, **ব**, **হ** পরে থাকে। যেমন, দিক্ + গজ = দিগ্‌গজ ; বাক্ + জাল = বাগ্‌জাল ; বাক্ + বিস্তার = বাগ্‌বিস্তার ; দিক্ + বিজয় = দিগ্বিজয়।

৭। **ত**-এর পরে **হ** থাকিলে দুয়ে মিলে **দ্ধ** হয়। যেমন, উৎ + হার = উদ্ধার ; উৎ + হত = উদ্ধত।

৮। 'ং' হবে তখন, যখন **ম্**-এর পরে **য**, **র**, **ল**, **ব** বা **শ**, **ষ**, **স** থাকবে। যেমন, সম্ + যোগ = সংযোগ ; সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন ; সম্ + বাদ = সংবাদ ; সম্ + শ্লিষ্ট = সংশ্লিষ্ট ; সম্ + হার = সংহার।

৯। **ম**-এর জায়গায় **ং** বা বর্গের পঞ্চম বর্ণ হবে তখনই যখন **ম**-এর পর স্পর্শবর্ণ থাকবে। যেমন, সম্ + কলম = সংকলন ; সম + কর = সংকর ; সম্ + গীত = সংগীত ; পরম + তপ = পরংতপ ; স্বয়ন + বর = স্বয়ংবর।

১০। '**চ্ছ**' হবে তখনই যখন **ত্** ও **দ্**-এর পরে **শ্** থাকবে। যেমন, বৃহৎ + শক্তি = বৃহচ্ছক্তি ; উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস ; তৎ + শক্তি = তচ্ছক্তি।

১১। স্বরবর্ণ পরে থাকলে **ছ্**-এ জায়গায় '**চ্ছ্**' হবে। যেমন, স্ব + ছন্দ = স্বচ্ছন্দ ; অ + ছাদন = আচ্ছাদন ; পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ ; পরি + ছদ = পরিচ্ছদ ; তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া।

১২। বর্গের প্রথম বর্ণের জায়গায় তৃতীয় বর্ণ হয় স্বরবর্ণ পরে থাকলে। যেমন, দিক্ +

অন্ত = দিগন্ত ; নিজ + অন্ত = নিজন্ত ; ষট্ + আনন = ষড়ানন ; জগৎ + ঈশ্বর = জগদীশ্বর ; সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত ।

বিসর্গ সন্ধি :

বিসর্গের সঙ্গে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে বিসর্গ সন্ধি বলে। যেমন,

বিসর্গ ও স্বরবর্ণের মিলনে :

দুঃ + আশা = দুরাশা ।
বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক ।

বিসর্গ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে—

পুরঃ + কার = পুরস্কার
অন্তঃ + গত = অন্তর্গত
মনোঃ + তাপ = মনোস্তাপ
নিঃ + চয় = নিশ্চয়
মনঃ + মোহন = মনোমোহন
ইতঃ + অতঃ = ইতস্ততঃ
প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতভ্রমণ
ততঃ + অধিক = ততোধিক

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি :

ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়মের বাইরেও কিছু কিছু সন্ধি হয়ে থাকে। এই সন্ধিগুলোকে ব্যাকরণ স্বীকার করে নিয়েছে। এজন্য এদের **নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি বলে**। যেমন—

গো + পদ = গোষ্পদ,
এক + দশ = একাদশ,
আ + চর্য = আশ্চর্য,
ষট্ + দশ = ষোড়শ
বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র
বন + পতি = বনস্পতি ।

মনে রেখো :

- বর্ণের সঙ্গে বর্ণের মিলনকে বলে সন্ধি ।
- সন্ধি দু'প্রকার ; স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি ।
- একমাত্র স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনেই স্বরসন্ধি হয় ।
- স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে ব্যঞ্জনসন্ধি হয় ।
- বিসর্গের সঙ্গে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে ।
- নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনে কতকগুলি সন্ধি হয়, বাংলা ব্যাকরণ এদের স্বীকার করে নিয়েছে। এদের নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি বলে ।
- সন্ধি ভেঙে যখন শব্দ দু'টি পৃথক করা হয় তখন তাকে সন্ধি বিচ্ছেদ বলে ।

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাকে বলে ? সন্ধি কেমন করে হয় ?

... ...

... ...

২। সন্ধি কয় প্রকার ও কি কি ?

... ...

... ...

... ...

... ...

৩। নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি কাকে বলে ?

... ...

... ...

৪। বিসর্গসন্ধি কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

... ...

... ...

৫। সন্ধি করতে ভুল হয়েছে। ভুল ও ঠিক দুটি শব্দই আছে। ঠিকটি পাশে লেখ ঃ

(ক) মিষ্ট + অন্ন = মিষ্টন্ন/মিষ্টান্ন (ক) ... ...

(খ) সৎ + জন = সৎজন/সজ্জন (খ) ... ...

(গ) গীত + অঞ্জলি = গীতঞ্জলি/গীতাঞ্জলি (গ) ... ...

(ঘ) সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়/সূর্যদয় (ঘ) ... ...

(ঙ) পুর + কার = পুরস্কার/পুরষ্কার (ঙ) ... ...

(চ) মনো + তাপ = মনস্তাপ/মনোস্তাপ (চ) ... ...

(ছ) বন + স্পতি = বনোস্পতি/বনষ্পতি (ছ) ... ...

৪। সন্ধিবদ্ধ কর ঃ

পূর্ণ + ইন্দু = ———। গো + অক্ষ = ———। শুদ্ধ + ওদন = ———।

সার + অঙ্গ = ———। স্তৌ + অক = ———। নৈ + অক = ———।

নব + অন্ন = ———। ভিক্ষা + অন্ন = ———। যথা + ইষ্ট = ———।

নর + উত্তম = ———। সু + আগত = ———। প্রতি + ঊষ = ———।

জগৎ + ঈশ্বর = ———। উৎ + জ্বল = ———। জগৎ + জননী = ———।

উৎ + লাস = ———। জগৎ + নাথ = ———। দিক্ + নাশ = ———।

উৎ + মত্ত = ———। বাক্ + ময় = ———। তৎ + টীকা = ———।

উৎ + ডীন = ———। উৎ + শ্বসিত = ———। সম্ + যুক্ত = ———।

সম্ + হিত = ———। সম্ + চয় = ———। কিম্ + নর = ———।

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

পর + ··· = পরোপকার। ··· + উদয় = সূর্যোদয়। ··· + উৎপল = নীলোৎপল।

··· + ঈশ = মহেশ। দিল্লী + ··· = দিল্লীশ্বর। মরু + ··· = মরূদ্যান।

সু + ·· = স্বাগত। ··· + ইক = নাবিক। মার্ত + ··· = মার্তণ্ড।

পরম + ··· = পরমৌষধ। এক + ··· = একৈক। ··· + উৎসব = দুর্গোৎসব।

··· + ময় = মৃণ্ময়। ··· + নিরূপণ = দিঙ্নিরূপণ। কিঞ্চিৎ + মাত্র = ···।

জগৎ + ··· = জগন্নাথ। সৎ + ··· = সদ্ব্যবহার তৎ + · · = তদ্রূপ।

অসৎ + ··· = অসদুপায়। তৎ + ··· = তদবধি। অনু + ··· = অনুচ্ছেদ।

প্রাক্ + ··· = প্রাগৈতিহাসিক। ··· + বোধন = উদ্বোধন। ··· + এক = অর্ধেক।

যে ভাষার সাহায্যে আমারা আমাদের মনের ভাবের আদান-প্রদান করি, তাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন,

(১) কথ্যভাষা, (২) লেখ্যভাষা

(১) ভাব বিনিময়ের জন্য মুখের ধ্বনির সাহায্যে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে বলে **কথ্যভাষা**।

২। লিখনের জন্য যে-ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে বলে **লেখ্যভাষা**।

লেখ্যভাষার আবার দু'টি রূপ ঃ

একটি **সাধুভাষা** ও অপরটি **চলিতভাষা**। সাধু ও চলিতভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়ার গঠন ও সর্বনামের ব্যবহারে লক্ষ্য করা যায়।

ভাষার বিন্যাস ঃ
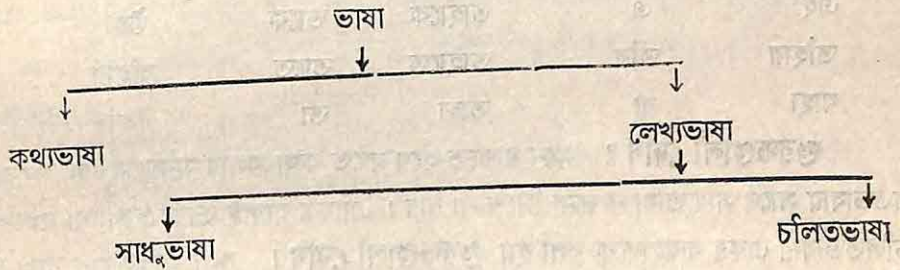
সর্বনাম পদের সাধু ও চলিতভাষার রূপ ঃ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
তাহার	তার	তাঁহারা	তাঁরা
কাহারা	কারা	কাহার	কার
তাঁহাকে	তাঁকে	উহাকে	ওকে
যাঁহারা	যাঁরা	যাঁহাদের	যাঁদের
উহার	ওরা	ইহারা	এরা

ক্রিয়াপদের সাধু ও চলিতভাষার রূপ ঃ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
আসিলাম	এলাম	যাইতেছে	যাচ্ছে	পড়িতে	পড়তে
আনিতে	আনতে	যাইতে	যেতে	আসিবেন	আসবেন
আসিব	আসব	লিখিয়াছে	লিখেছে	আসিয়াছেন	এসেছেন

বিশেষ্য পদের সাধু ও চলিতভাষার রূপ ঃ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
ভগিনী	বোন	মানব	মানুষ	গৃহ	ঘর
বৃক্ষ	গাছ	প্রান্তর	মাঠ	মাতা	মা
বালিকা	মেয়ে	পিতা	বাবা	বালক	ছেলে
মৃগ	হরিণ	ছত্র	ছাতা	সখা	বন্ধু

সর্বনাম পদের সাধু ও চলিতভাষার রূপ ঃ

সাধু	চলতি	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
ইহার	এর	ইহাতে	এতে	উহাকে	ওকে
এই	এ	তাহাকে	তাকে	উহা	ও
তাঁহার	তাঁর	তাহাতে	তাতে	যাঁহার	যাঁর
যাহা	যা	তাহা	তা	উহার	ওর

গুরুচণ্ডালী দোষ ঃ মনে রাখতে হবে যাতে কথা বলার সময় অথবা কিছু লিখবার সময় চলিতভাষার সাথে সাধুভাষা কখনো মিশে না যায়। এরকম হলেই ভাষা লেখা বা বলা অশুদ্ধ হবে। সাধু ও চলিতভাষার একত্র ব্যবহারকে বলা হয় **গুরুচণ্ডালী দোষ**। বলা বা লেখার সময় যে-কোন একরকম ভাষা ব্যবহার করবে। যখন চলিতভাষা ব্যবহার করবে তখন তাতে সাধুভাষা ব্যবহার করবে না। আবার যখন সাধুভাষা ব্যবহার করবে তখন চলিতভাষা ব্যবহার করবে না। সাধুভাষার সাথে সাধুভাষার বা চলিতভাষার সাথে চলতিভাষাই ব্যবহার করবে, যেমন—তাহারা যাচ্ছিল বা তাহারা ক্লাসে গোলমাল করছিল—এভাবে লেখা বা বলা ভুল। কারণ **তাহারা** সর্বনাম পদটি সাধুভাষা আর **যাচ্ছিল** এবং **করছিল** ক্রিয়াপদটি চলিতভাষার রূপ। দুরকম মিশিয়ে বলা বা লেখা ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ। এ-বাক্য দুটি ঠিকভাবে বলতে বা লিখতে হলে এভাবে লিখতে হবে। যেমন—

তাহারা যাইতেছিল। (সাধু)।

তারা যাচ্ছিল। (চলিত)।

তাহারা গোলমাল করিতেছিল। (সাধু)
তারা গোলমাল করছিল। (চলিত)।

ক্রিয়াপদ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
করিতেছে	করছে	বলিতেছেন	বলছেন
যাইতেছি	যাচ্ছি	গাহিতেছে	গাইছে
করিলাম	করলাম	খাইতেছি	খাচ্চি
করিত	করত	হইল	হল
পাইয়া	পেয়ে	সাজিয়া	সেজে

সাধুভাষা ও চলিতভাষার আরও কয়েকটি উদাহরণ ঃ

১. চলিতভাষা ঃ

কত রকমের কত ওষুধ রাজামশাই খেয়ে দেখলেন, কিছুতেই কিছু হল না। মাথায় বরফ দেওয়া হল, পেটে সেঁক দেওয়া হল কিন্তু অসুখের কোন কিনারাই হল না।

সাধুভাষায় রূপান্তর ঃ

কত রকমের কত ঔষধ রাজামশাই খাইয়া দেখিলেন ; কিছুতেই কিছু হইল না। মাথায় বরফ দেওয়া হইল, পেটে সেঁক দেওয়া হইল কিন্তু অসুখের কোন কিনারাই হইল না।

২. চলিতভাষা ঃ

গ্রামের মানুষের এই লড়াই বৃথা যায়নি। তারা দলে দলে জেলে গিয়ে, লড়াই করে, প্রাণ দিয়ে ইংরেজ নীলকরের বুকে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল। তারই ফলে নীলকরেরা নীলচাষের নামে অত্যাচার বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

সাধুভাষায় রূপান্তর ঃ

গ্রামের মানুষের এই লড়াই বৃথা যায় নাই। তাহারা দলে দলে জেলে গমন করিয়া, লড়াই করিয়া, প্রাণ দিয়া ইংরাজ নীলকরের বুকে ভয় ঢুকাইয়া দিতে পারিয়াছিল। তাহারই ফলে নীলকরেরা নীলচাষের নামে অত্যাচার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

৩. চলিতভাষা ঃ

রাজা বললেন, "কেন" ?

বিদূষক বললে, "আমি মারতে পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।"

সাধুভাষায় রূপান্তর ঃ

রাজা বলিলেন, "কেন" ?

বিদূষক বলিল,—"আমি মারিতে পারি না, কাটিতেও পারি না, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসিতে পারি। মহারাজের সভায় থাকিলে আমি হাসিতে ভুলিয়া যাইব।"

৪. **চলিতভাষা ঃ**

ভারতবর্ষের মাটির উপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম। জাহাজে উঠে বম্বে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। এত বড়ো ভারতবর্ষ এসে এতটুকু নগরপ্রান্তে ঠেকেছে, আর কয়েক মুহূর্তে এইটুকুও স্বপ্ন হবে।

সাধুভাষায় রূপান্তর ঃ

ভারতবর্ষের মাটির উপর হইতে শেষবারের মত পা তুলিয়া লইলাম। জাহাজে উঠিয়া বম্বে দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনই করুণ। বিশাল ভারতবর্ষ আসিয়া ক্ষুদ্র নগরপ্রান্তে ঠেকিয়াছে, আর কয়েক মুহূর্তে ইহাও স্বপ্ন হইবে।

মনে রেখো

- ভাষার দু'টি রূপ কথ্যভাষা ও লেখ্যভাষা।
- লেখ্যভাষাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; সাধু ও চলিত।
- মৌখিক আলাপ আলোচনায় ব্যবহৃত ভাষাই চলিতভাষা আর লিখনের জন্য ব্যবহৃত ভাষাই সাধুভাষা।

অনুশীলনী

১। **সাধুভাষা কাকে বলে ? চলিতভাষা কাকে বলে ?**

... ...

... ...

... ...

... ...

২। **চলিতভাষা ও সাধুভাষার কয়েকটি উদাহরণ দাও।**

... ...

... ...

৩। কোন্ কোন্ পদে সাধুভাষা ও চলিতভাষার প্রধান পার্থক্য ধরা পড়ে ?

....

... ...

৪। নীচের বাক্যগুলির মধ্য থেকে সাধুভাষার সর্বনামপদ ও ক্রিয়াপদ বার করে তাদের চলতিভাষায় পরিবর্তিত কর ঃ

(ক) তুমি খেলা করিতেছিলে।

... ...

(খ) আমি কাল পথে দাঁড়াইয়াছিলাম।

... ...

(গ) তারা বেড়িয়ে ফিরে আসিল।

... ...

(ঘ) যে যে পড়া করনি তারা চলে যাও।

....

(ঙ) তাকে আমার কথা বলিও না।

... ...

(চ) আমরা কাল দিল্লী যাইব।

... ...

৬। সাধুভাষায় পরিবর্তিত কর ঃ

(ক) নদীকে জিজ্ঞেস করলুম, নদী তুমি কোথা থেকে আসছ ?

... ...

(খ) পুজোর সময় তারা দামী কাপড় কেনে।

... ...

(গ) ভালুককে আসতে দেখে সে মাটিতে মড়ার মত শুয়ে পড়ল।

... ...

(ঘ) বিকেলে সকলে মিলে মিশে চিড়েখানায় যাব।

... ...

৭। চলিতভাষায় পরিবর্তিত কর ঃ

... ...

... ...

(ক) মূষিক মার্জারকে দেখিয়া পলায়ন করে না।

... ...

(খ) গাছে আরোহণ করিয়া নিচের বন্ধুকে দেখিতে লাগিল।

... ...

(গ) বিদ্যাসাগরকে অনেক কষ্ট করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল।

... ...

৮। ভুলকে শুদ্ধ কর ঃ

... ...

... ...

(ক) সোদপুর স্টেশনে গিয়ে দেখিল।

... ...

(খ) বিমলরা পুজোর সময় বাড়ি আসিলে।

... ...

(গ) তোমরা কোথায় যাইবেন ?

... ...

(ঘ) বাজার থেকে মাছ কিনে আনিল।

... ...

(ঙ) হাওড়ায় এলে আমরা সকলে মিলে পশুশালা দেখিতে যাইব।

... ...

আমরা কথা বলা বা লেখার সময় এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করে থাকি যেগুলো উচ্চারণে বা শুনতে প্রায় একই রকম মনে হলেও তাদের বানান ও অর্থ একেবারে ভিন্ন। **এদেরকেই সমোচ্চারিত শব্দ বলে।** বাংলায় কথা বলতে বা লিখতে গেলে এই প্রকার শব্দ শেখা দরকার, না হলে অনেক সময় অসুবিধেয় পড়তে হয়। এরকম কিছু শব্দের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল ঃ

দিন (দিবস)—দিন দিন আয়ুহীন।
দীন (দরিদ্র)—দীনকে সকলে দয়া কর।
শয্যা (বিছানা)—কোমল শয্যায় বেশ সুনিদ্রা হয়।
সজ্জা (সাজ) - যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার পূর্বে অস্ত্রসজ্জা করা দরকার।
বিনা (ছাড়া) – কানু বিনা অন্য গীত নাই।
বীণা (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) —বীণার তার ছিঁড়ে গেল।
বান (বন্যা) – মরা গাঙে বান এসেছে।
বাণ (তীর)—সিদ্ধার্থ বাণবিদ্ধ পাখিটিকে কোলে লইলেন।
কুল (বংশ) —কুল-শীল জানিয়া আশ্রয় দিবে।
কূল (নদীর তীর)—কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।
সুর (দেবতা) - সুর-অসুরের যুদ্ধে সুরেরাই জয়ী হয়।
শূর (বীর) –হারাবংশী শূরেরা যুদ্ধ করিয়াছিল।
শারদা (দুর্গা) - শরৎকালে শারদার আরাধনায় ছাত্র-ছাত্রীরা মেতে উঠল।
সারদা (সরস্বতী) - সারদার হাতে বীণা থাকে।
দেশ (দেশ)—'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'।
দ্বেষ (হিংসা) – হিংসা-দ্বেষ পরিহার কর।
বিত্ত (ধন) – চিরকাল বিত্তবানেরাই সমাজে প্রভুত্ব করিয়া থাকে।
বৃত্ত (গোলাকার)—লক্ষ্মণ সীতাকে একটি বৃত্তের মধ্যে থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন।
শব (মৃতদেহ)—কাপালিকেরা তপস্যা করেন শবাসনে।
সব (সকল)—আমরা সবাই ভারতবাসী।

অন্য (অপর)—সর্বদা অন্য বই পড়িতে নেই।

অন্ন (ভাত)– অন্নহীনে অন্নদান কর।

লক্ষ্মণ (রামের ভাই)—রামের সাথে লক্ষ্মণও বারো বছর বনবাস জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

লক্ষণ (চিহ্ন)—পরীক্ষায় পাস করার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

গিরিশ (মহাদেব)—সকল দেবতার প্রধান হলেন গিরিশ।

গিরীশ (হিমালয়)—ভারতের উত্তরে গিরীশ বিরাজ করিতেছে।

এইরকম বহু শব্দ বাংলা ভাষায় আছে। যেমন ঃ

বলি (পূজার সামগ্রী), বলী (বলবান) ; কুজন (মন্দ লোক), কূজন (পাখির ডাক) ; নারী (স্ত্রীলোক), নাড়ী (শিরা বিশেষ) ; কালি (লেখার কালি), কালী (দেবতা) ; নীর (জল), নীড় (পাখির বাসা) ; নিতি (প্রত্যহ), নীতি (নিয়ম) ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। সমোচ্চারিত শব্দ কাকে বলে ?

... ...

... ...

... ...

২। নীচে দেওয়া শব্দগুলির অর্থ-পার্থক্য লেখ ঃ

চূড় / চুড়ি ; শীত / সিত ; আপন / আপণ ; অবিহিত / অভিহিত ; সর / স্বর।

... ...

... ...

... ...

... ...

৩। নীচের বাক্যটিকে ঠিক করে লেখ ঃ

চির-পরিহিত সন্ন্যাসীরা চীরকাল আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

... ...

... ...

... ...

৪। নীচের বাক্যগুলির পরিবর্তে একটি মাত্র শব্দ লেখ ঃ

(ক) পাখির বাসা।

(খ) বলবান ব্যক্তি।

(গ) পূজার সামগ্রী।

... ...

... ...

... ...

৫। বাক্য রচনা কর।

অন্ন, অন্য। বিনা, বীণা।

কালি, কালী। নিত, নীত।

... ...

... ...

... .

.. ..

বাংলা ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন বহু শব্দ আছে যাদের অর্থ একই, এদের **একার্থবোধক, প্রতিশব্দ, সমনাম** প্রভৃতি শব্দ বলে। এই সব শব্দ জানা থাকলে একই শব্দ বারবার ব্যবহার করতে হয় না। ফলে ভাষা সুন্দর হয়, শুনতে ও পড়তে ভাল লাগে। নীচে এইরকম কিছু শব্দ দেওয়া হল ঃ

শরীর – তনু, দেহ, অঙ্গ, কলেবর, বপু, কায়া।
চক্ষু – নয়ন, লোচন, নেত্র, চোখ, অক্ষি।
চুল – কেশ, অলক, কুন্তল, চিকুর।
কর্ণ – কান, শ্রুতি, শ্রবণ।
পিতা – জনক, জন্মদাতা, পিতৃদেব, বাপ।
মা – মাতা, জননী, অম্বা, গর্ভধারিণী।
পুত্র – তনয়, সুত, নন্দন।
কন্যা – তনয়া, নন্দিনী, দুহিতা, মেয়ে।
বন্ধু – মিত্র, সখা, সহচর, বান্ধব।
নদী – তটিনী, সরিৎ, স্রোতস্বিনী, প্রবাহিণী।
পৃথিবী – ধরা, অবনী, মহী, মেদিনী, ক্ষিতি, বিশ্ব, বসুন্ধরা, ভুবন, বসুমতী।
পর্বত – শৈল, গিরি, অচল, পাহাড়, নগ, শিখরী।
সমুদ্র – পারাবার, সিন্ধু, পাথার, অর্ণব, জলধি।
চন্দ্র – শশধর, সোম, সুধাংশু, শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক, বিধু।
সূর্য – অরুণ, তপন, দিবাকর, মিহির, ভাস্কর, ভানু।
আকাশ – গগন, অম্বর, বিমান, ব্যোম, অনন্ত, শূন্য।
বন – কানন, অরণ্য, অটবী, কান্তার, বিপিন।
মেঘ – বারিদ, অভ্র, জলদ, জীমূত, ঘন, নীরদ, পয়োদ।
বায়ু – অনিল, পবন, সমীর, বাতাস, বাত, মরুৎ।
বিদ্যুৎ – অশনি, চপলা, তড়িৎ, বিজলী, সৌদামিনী।
জল – নীর, উদক, সলিল, অম্বু, তোয়, পয়ঃ।
পাখী – বিহঙ্গ, খেচর, বিহগ, পক্ষী, দ্বিজ, খগ।

মৌমাছি – অলি, মধুকর, ভ্রমর, মধুপ।
ব্যাঙ – ভেক, দাদুরী, মণ্ডুক।
অগ্নি – বহ্নি, অনল, পাবক, হুতাশন, দহন, আগুন।
অন্ধকার – তিমির, তমসা, আঁধার।
কিরণ – প্রভা, কর, রশ্মি, অংশু, মরীচি, বিভা।
কথা – বাক্য, বচন, উক্তি।
গৃহ – ভবন, আবাস, নিকেতন, বাড়ি, বাটি, আলয়।
নারী – রমণী, মহিলা, স্ত্রী।
পদ্ম – সরোজ, পঙ্কজ, উৎপল, কমল, শতদল, অরবিন্দ।
যুদ্ধ – রণ, সংগ্রাম, সমর, বিগ্রহ, আহব।
রাজা – নৃপতি, নরেশ, ভূপতি।
রাত্রি – রজনী, নিশা, যামিনী, রাত, ত্রিযামা।
বৃক্ষ – তরু, বিটপ, পাদপ, গাছ।
ময়ূর – শিখী, কলাপী, অহিভুক।
স্বর্ণ – হেম, কনক, কাঞ্চন।
হস্ত – ভুজ, বাহু, কর, পাণি, হাত।
ঈশ্বর – বিভু, স্রষ্টা, পরমেশ্বর, ভগবান্।
দেবতা – সুর, অমর, দেব, দানবারি।
ইচ্ছা – বাসনা, সাধ, স্পৃহা, কামনা।
মৃত্যু – লোকান্তর, দেহত্যাগ, মহাযাত্রা।
ফুল – পুষ্প, কুসুম, প্রসূন।
মানুষ – মানব, মনুষ্য, নর।
ভূমি – মাটি, ক্ষেত্র, ভূপৃষ্ঠ।

ঘোড়া- তুরগ, বাজী, অশ্ব, হয়, ঘোটক, তুরঙ্গম।
গরু – গো, ধেনু, বৃষ, গাভী।
হাতী—গজ, বারণ, করী, মাতঙ্গ, দ্বিপ, দ্বিরদ।
সাপ—নাগ, ফণী, অহি, সর্প, ভুজঙ্গ, বিষধর।
হাত – হস্ত, কর, পাণি, ভুজ, বাহু।
নাক – নাসিকা, নাসা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়।
দাঁত – দন্ত, দশন, রদ।
ঘাড় – গ্রীবা।
বুক - বক্ষঃ, বক্ষস্থল, উরস্, হৃদয়।
পা – পদ, চরণ, পাদ।
মানুষ – মনুষ্য, নর, লোক।
সিংহ—পশুরাজ, কেশরী, মৃগেন্দ্র, হর্যক্ষ, মৃগরাজ।
ব্যাঘ্র—বাঘ, শার্দুল।
জন্তু—পশু, জানোয়ার, প্রাণী, জীব।
মৎস্য—মাছ, মীন।
কোকিল - পিক, পরভৃত, বসন্তসখা।
কাক—বায়স, পরভৃৎ।
জানালা—গবাক্ষ, বাতায়ন।
উঠোন—প্রাঙ্গণ, অঙ্গন, চাতাল, আঙিনা, চত্বর।
কক্ষ—ঘর, কামরা, প্রকোষ্ঠ।
কাপড়—বস্ত্র, বাস, বসন, পরিধেয়, পরিধান, অম্বর।
উদ্যান—বাগান, বাগিচা, উপবন।
উনান—উনুন, চুলা, চুল্লী, আখা।
পুকুর—পুষ্করিণী, জলাশয়, তড়াগ, দীঘি, সরস, সরঃ, সরোবর।
মন্দির—দেউল, দেবালয়, উপাসনা-গৃহ, ভজনালয়।
পূজা—অর্চনা, উপাসনা, আরাধনা, বন্দনা, ভজনা।
স্বামী—পতি, বর, ভর্তা।
স্ত্রী—পত্নী, বধূ, দারা, জায়া, কলত্র, বণিতা, সহধর্মিণী।

মাথা—মস্তক, মুণ্ড, শির।
মুখ—বদন, আনন, মুখমণ্ডল, আস্য।
গলা—কণ্ঠ, গলদেশ।
কাঁধ—স্কন্ধ, অংস।
ভাই—ভ্রাতা, সহোদর, সোদর।
বোন—ভগিনী, সহোদরা।
শিক্ষক—গুরু, অধ্যাপক, বিদ্যাদাতা, শিক্ষাগুরু, আচার্য।
চাকর—ভৃত্য, দাস, সেবক।
অতিথি—আগন্তুক, অভ্যাগত, আমন্ত্রিত, নিমন্ত্রিত।
দেবতা—দেব, অমর, সুর, অসুরারি, দানবারি।
শিব—মহাদেব, মহেশ্বর, মহেশ, শম্ভু, বিশ্বনাথ, ভূতনাথ, চন্দ্রশেখর, গঙ্গাধর।
দুর্গা—পার্বতী, উমা, শারদা, চণ্ডী, শিবানী, ভবানী, দশভুজা।
গঙ্গা—জাহ্নবী, ভাগীরথী, সুরধনী, ভোগবতী।
লক্ষ্মী কমলা, শ্রী, বিষ্ণুপ্রিয়া, নারায়ণী।
সরস্বতী—সারদা, বীণাপাণি, জ্ঞানদা, বাগ্‌দেবী, কাদম্বরী, বিদ্যাদেবী, বাগ্‌বাদিনী, বাগীশ্বরী।
ইচ্ছা—অভিলাষ, অভিপ্রায়, বাসনা, কামনা, স্পৃহা, বাঞ্ছা।
রাগ—ক্রোধ, কোপ, রোষ।
লোভ—লিপ্সা, লালসা, কামনা।
মুক্তি—উদ্ধার, ত্রাণ, নিষ্কৃতি, পরিত্রাণ।
আনন্দ – আমোদ, প্রমোদ, স্ফূর্তি, পুলক।
কান্না—ক্রন্দন, রোদন।
লজ্জা—লাজ, সরম, ব্রীড়া।
ঈর্ষা—অসূয়া, হিংসা।
ব্যথা—বেদনা, কষ্ট, যন্ত্রণা।

অনুশীলনী

১। একার্থবোধক শব্দ কাকে বলে ? এর আর কি কি নাম আছে ?

... ...

... ...

... ...

... ...

২। মোটা অক্ষরে লেখা শব্দগুলির বদলে দুটি করে শব্দ বসাও যাদের অর্থ এক ঃ

... ...

... ...

... ...

... ...

(ক) ভীষণ **হাওয়া** বইছে। (খ) **জানালা বন্ধ** কর। (গ) **অতিথিকে** আপ্যায়ন কর।

(ঘ) **প্রভাতে সূর্য** ওঠে। (ঙ) **মন্দিরেতে** কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং।

৩। মোটা শব্দগুলির প্রতিশব্দ দিয়ে শূন্য জায়গা পূরণ কর ঃ

(ক) **লক্ষ্মীকে** আমরা·········নামেও ডেকে থাকি। (খ) **ফুলকে** রাম···········বলে।
(গ) আকাশকে আমরা···········বলে থাকি। (ঘ) **শিব** যেখানে থাকেন সে জায়গার নামও··········।

৪। নিচের শব্দগুলির তিনটি ক'রে সমনাম লেখ ঃ

পৃথিবী ঃ (১) ——— (২) ——— (৩) ———।
আকাশ ঃ (১) ——— (২) ——— (৩) ———।
সূর্য ঃ (১) ——— (২) ——— (৩) ———।
চক্ষু ঃ (১) ——— (২) ——— (৩) ———।
জল ঃ (১) ——— (২) ——— (৩) ———।
নদী ঃ (১) ——— (২) ——— (৩) ———।
পদ্ম ঃ (১) ——— (২) ——— (৩) ———।

বিপরীতার্থক শব্দ

১৬

শিক্ষক মহাশয় বললেন—**দিন রাত** শব্দ খেলা করা ঠিক নয়। এখানে আমরা দুটি শব্দ পেলাম 'দিন' ও 'রাত'। এই দুটি শব্দ একটি অপরটির ঠিক উল্টো। দিন হচ্ছে সূর্যের আলোয় আলোকিত মানুষের কর্মের সময়। রাত হ'ল সূর্য কিরণ বঞ্চিত মানুষের বিশ্রামের সময়। তেমনি বলা যায় আমি 'আগা গোড়া বইটি পড়েছি'। গোড়া হ'ল সুরু আগা হল শেষ। সুন্দরভাবে ভাষার প্রয়োগ করতে হলে বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার শেখা আবশ্যক।

নীচে এরকম কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল ঃ—

অনুকূল – প্রতিকূল
যশ—অপযশ
আবির্ভাব—তিরোভাব
সরস—নীরস
সঞ্চয়—অপচয়
সুকর—দুষ্কর
স্বজাতীয়—বিজাতীয়
ভাল—মন্দ
জীবিত—মৃত
সাদা—কালো
হাসি—কান্না
পূর্ব—পশ্চিম
অগ্র—পশ্চাৎ
ডান—বাম
আয়—ব্যয়
আলো—অন্ধকার
লঘু—গুরু
চঞ্চল—শান্ত
বন্ধন—মুক্তি

অনুগ্রহ—নিগ্রহ
সৌভাগ্য—দুর্ভাগ্য
উপকার—অপকার
প্রত্যক্ষ পরোক্ষ
সুশীল—দুঃশীল
সুলভ—দুর্লভ
সভয়—নির্ভয়
রাত্রি—দিন
আগমন—নির্গমন
উঁচু—নীচু
সুখ—দুঃখ
পেট—পিঠ
উত্তর—দক্ষিণ
আপদ—সম্পদ
আবাহন—বিসর্জন
ইহকাল—পরকাল
চোর—সাধু
পাকা—কাঁচা
উদয়—অস্ত

ব্যর্থ—সার্থক
ঘরে—বাইরে
ধনী—দরিদ্র
সাহসী—ভীরু
বিরহ—মিলন
উত্থান—পতন
গুরু—শিষ্য
সংক্ষিপ্ত—বিস্তৃত
মুখ্য—গৌণ
নিন্দা—প্রশংসা
সরস—নীরস
বেচা—কেনা
ইচ্ছা—অনিচ্ছা
যোগ—বিয়োগ
লোভী—নির্লোভ
উন্নতি—অবনতি
জন্ম—মৃত্যু
শীতল—উষ্ণ
আলো—আঁধার

সত্য—মিথ্যা
গ্রাম—শহর
স্থাবর—জঙ্গম
পাপ—পুণ্য
স্বাধীন—পরাধীন
দেনা—পাওনা
উত্তম—মাধ্যম
অমৃত—গরল
শত্রু—মিত্র
মোটা—সরু।

অনুশীলনী

১। বিপরীতার্থক শব্দ কাকে বলে ? বাংলা ভাষায় বিপরীতার্থক শব্দের দরকার কেন ?

... ...

... ...

... ...

... ...

২। কয়েকটি বিপরীতার্থক শব্দ লেখ।

... ...

... ...

... ...

... ...

৩। নীচের শূন্যস্থানগুলিতে বিপরীতার্থক শব্দ বসাও। একটি আদর্শ দেওয়া হল।

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
নকল	আসল	বাড়ী	....
পরিশ্রমী	....	দিন	....
গরল	....	মৃত্যু	....
পতন	....	বিদেশ	....
কোমল	....	গ্রীষ্ম	....
অন্ত	....	শান্ত	....

৪। নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখে প্রত্যেকটি বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	বাক্য
পর	....	....
ভদ্র	....	....
মেয়ে	....	....
পাওনা	....	....
নীচ	....	....
আয়	....	....

৫। নিচের বাক্যগুলির শূন্যস্থানে বিপরীতার্থক শব্দ বসাও ঃ

(ক) জন্মিলে............হবে অমর কে কোথা কবে ?

(খ) কোথায় স্বর্গ কোথায়..........কে বলে তা বহুদূর।

(গ) দিনের পর...........আসে।

(ঘ) আমরা আরম্ভ করি তোমরা..........কর।

(ঙ) ছেলে থেকে ....অবধি সবাই নাচতে লাগল।

৬। সঠিক বিপরীতার্থক শব্দের উপর ✓ চিহ্ন দাও ঃ

জমা——খরচ / ব্যয়

শুকনো——আর্দ্র / ভিজে

বালক ——তরুণ / বৃদ্ধ

জয়——বিজয় / পরাজয়

দোষী —— ভালো / নির্দোষ

সুন্দর কুৎসিত / নিকৃষ্ট

শুদ্ধ বানান শিক্ষা

১৭

বর্ণের সমষ্টিতে শব্দ আর শব্দকে পরপর সাজিয়ে অর্থপূর্ণ করে বাক্য গঠিত হয়। এই বাক্য দিয়েই আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি। নানাভাবে ও নানা কারণে আমাদের ব্যবহৃত শব্দের বানানে ভুল হয়ে যায়। বানান ভুলের জন্য আবার শব্দের অর্থও বিপরীত হয়ে যায়। এই কারণেই শুদ্ধ বানান শেখা প্রয়োজন।

বানান কেন ভুল হয়?

১। শব্দগুলোকে ঠিকমত উচ্চারণ করতে না শিখলে উচ্চারণের দোষে বানান লেখা ভুল হবে।

২। বাংলায় হ্রস্ব-ই ও দীর্ঘ-ঈ আর হ্রস্ব-উ ও দীর্ঘ-ঊ-এর উচ্চারণে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু নিয়ম না শেখার ফলে এগুলোর বানান ভুল হয়।

৩। সন্ধির নিয়ম ঠিকমত না জানলে বানান ভুল হবে।

৪। ন, ণ, শ, স ও ষ-এর উচ্চারণে পার্থক্য বিশেষ নেই, তবুও প্রয়োগের নিয়ম না শিখলে বানান ভুল হবে।

সেজন্য অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে উপরের কথাগুলো মনে রেখে শিক্ষার্থীকে বানান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

সাধারণ ভাবে প্রায়ই যে সব বানান আমরা ভুল শিখে থাকি তার কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:

ক) আ-কারে ভুল:

ভুল	শুদ্ধ	ভুল	শুদ্ধ
ব্যায়	ব্যয়	অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
ব্যাবহার	ব্যবহার	আমাবস্যা	অমাবস্যা
ব্যাস্ত	ব্যস্ত	ব্যাগ্র	ব্যগ্র
ব্যাক্তি	ব্যক্তি	অনাটন	অনটন
ব্যাবসায়	ব্যবসায়		

(খ) ই ও ঈ-কারের ভুল ঃ

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
বাল্মিকী	বাল্মীকি	দধিচী	দধীচি	প্রতিক্ষা	প্রতীক্ষা
পরিক্ষা	পরীক্ষা	রবিন্দ্র	রবীন্দ্র	অধিন	অধীন
নিরব	নীরব	সারথী	সারথি	নিশিথ	নিশীথ
দাশরথী	দাশরথি	প্রতিক্ষা	প্রতীক্ষা	নিরোগ	নীরোগ
মিমাংসা	মীমাংসা	ভাগীরথি	ভাগীরথী	পিপিলিকা	পিপীলিকা
অশিবার্দ	আশীর্বাদ	পৃথিবি	পৃথিবী	কালীদাস	কালিদাস

(গ) উ ও ঊ-কারের ভুল ঃ

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
মুল্য	মূল্য	তূল্য	তুল্য	উর্ধ্ব	ঊর্ধ্ব
নূতন, নতূন	নূতন, নতুন	ভূবন	ভুবন	দূর্গা	দুর্গা
কৌতূক	কৌতুক	পুজা	পূজা	মূহুর্ত	মুহূর্ত
বধু	বধূ	মুর্খ	মূর্খ	নুপুর	নূপুর
রুপ	রূপ	মুমুর্ষু	মুমূর্ষু	ময়ুর	ময়ূর
অদ্ভূত	অদ্ভুত	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা	ভূল	ভুল
দুর	দূর	পূণ্য	পুণ্য	বিদূষী	বিদুষী
প্রত্যুষ	প্রত্যূষ	দুর্বা	দূর্বা	পুর্ণ	পূর্ণ
অনুকুল	অনুকূল	উনবিংশ	ঊনবিংশ	মধুসুদন	মধুসূদন
ভুত	ভূত	কৌতুহল	কৌতূহল		

(ঘ) ন এবং ণ-এর ভুল ঃ

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
কানা	কাণা	পন	পণ	মৃণ্ময়	মৃন্ময়
তৃন	তৃণ	মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন	মুণি	মুনি
প্রনাম	প্রণাম	অঙগণ	অঙ্গন	কর্ন	কর্ণ
পরিমান	পরিমাণ	বহ্ণি	বহ্নি	প্রবীন	প্রবীণ
পুন্য	পুণ্য	বানিজ্য	বাণিজ্য	প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ
ফাল্গুণ	ফাল্গুন	বনিক	বণিক	কনিকা	কণিকা
গগণ	গগন	লাবন্য	লাবণ্য	অপরাহ্ণ	অপরাহ্ন
মৃনাল	মৃণাল	আগুণ	আগুন	অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ
মনি	মণি	রামায়ন	রামায়ণ	কল্যান	কল্যাণ

(ঙ) শ, ষ ও স-এর ভুল ঃ

ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান
অভিসেক	অভিষেক	ভাসণ	ভাষণ	দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
বিসাদ	বিষাদ	যুধিস্টির	যুধিষ্ঠির	নিসেধ	নিষেধ
আবিস্কার	আবিষ্কার	বিমর্শ	বিমর্ষ	নমষ্কার	নমস্কার
শষ্য	শস্য	বিসন্ন	বিষণ্ণ	পুস্প	পুষ্প
পরিস্কার	পরিষ্কার	ভাষ্কর	ভাস্কর	বিসম	বিষম
আসাঢ়	আষাঢ়	আমিস	আমিষ	অসৌচ	অশৌচ
দুস্কর	দুষ্কর	চাক্ষুস	চাক্ষুষ	পাসাণ	পাষাণ
পুরষ্কার	পুরস্কার	অনুস্ঠান	অনুষ্ঠান	বহিস্কার	বহিষ্কার
তিরষ্কার	তিরস্কার	প্রসংসা	প্রশংসা	ষান্মাষিক	ষাণ্মাসিক
প্রতিস্ঠান	প্রতিষ্ঠান	বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি	অমাবশ্যা	অমাবস্যা
অনুসোচনা	অনুশোচনা				

(চ) অন্যান্য ভুল ঃ

মনযোগ	মনোযোগ	কিম্বা	কিংবা	অহর্নিশি	অহর্নিশ
বিদ্যান	বিদ্বান	মনহর	মনোহর	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
নির্দোষী	নির্দোষ	কালিপদ	কালীপদ	দুরাবস্হা	দুরবস্হা
মহারাজা	মহারাজ	সাহার্য	সাহায্য	ফণীভূষণ	ফণিভূষণ
শিরচ্ছেদ।	শিরশ্ছেদ	জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু	যদ্যাপি	যদ্যপি
ব্যার্থ	ব্যর্থ	উজ্জল	উজ্জ্বল	ব্যধি	ব্যাধি
শশ্মান	শ্মশান	সান্তনা	সান্ত্বনা	সন্নাসী	সন্ন্যাসী
মুখস্ত	মুখস্হ	উচিৎ	উচিত	পক্ক	পক্ব
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	ব্যাবস্হা	ব্যবস্হা	স্বরস্বতী	সরস্বতী
পৈত্রিক	পৈতৃক	অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়	আকাঙখা	আকাঙ্ক্ষা

পর পৃষ্ঠায় কতকগুলো বানান দেওয়া হল যেগুলো আমাদের প্রায় সময়ই কাজে লাগে, কিন্তু লিখতে গিয়ে আমরা অসুবিধের মধ্যে পড়ি –কোন্‌টা ঠিক ? তোমরা এই বানানগুলি যত্ন করে শিখে রাখলে আর ভুল হবে না। এখানে শুদ্ধ বানানটিই দেওয়া হল।

মণি, মানিক ; অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ; ধরন, ধারণা ; রসায়ন, রামায়ণ ; বর্ষণ, দর্শন ; গুণ ; আগুন ; রোপণ , বপন ; ভীষ্ম, ভস্ম ; কৃশ, কৃষক ; পরা (কাপড় পরা), পড়া (পড়ে যাওয়া,

লেখাপড়া) ; নীর (জল), নীড় (পাখির বাসা) ; ব্যঙ্গ, ব্যাঙগমা ; অষ্ট, ষষ্ঠ ; জোর (শক্তি), জোড় (দুটি) ; পাগল, ভূগোল ; সারা, সাড়া (শব্দ) ; স্থান, স্থাণু ; লক্ষ্য (দৃষ্টি) ; শ্বশুর, শাশুড়ী ; লক্ষণ (চিহ্ন), লক্ষ্মণ (লোকের নাম) ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। নীচের যে যে বানান শুদ্ধ তাদের ওপর ✓ চিহ্ন দাও এবং যে যে বানান ভুল তার ওপর × চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ বানান লেখ ঃ

অতিত........, কৌতুহল........, পৃথিবী........, গণনা ...., উর্ধ্ব........, পুরস্কার........, তিরস্কার........, পুরোহিত........, পৌরহিত্য......, স্বরসতী......, দুর্গা..........., লক্ষ্মী..........., মনিষি..........., মুখ্য........, মুর্খ.........,

২। নীচে দুটি করে শব্দ দেওয়া আছে, যেটি ভুল সেটি কেটে দাও ঃ

ভ্রাম্যমান/ভ্রাম্যমাণ, নিরব/নীরব, প্রশংসা/প্রসংসা, অঞ্জলী/অঞ্জলি, বন্দোপাধ্যায় / বন্দ্যোপাধ্যায়, দারিদ্র্য / দারিদ্র, পরিক্ষা/পরীক্ষা, উজ্জল/উজ্জ্বল, যথেস্ট/যথেষ্ঠ।

৩। নীচের চিঠিখানায় ভুল রয়েছে শুদ্ধ করে দাও ঃ

শ্রীচরণেসু,

গত বৃহস্পতিবার আপনার একটি চিঠি পেয়ে শকল সংবাদ শবিসেষ যানতে পারলাম। আপনার কুসল সংবাদ না পেয়ে বেস চিন্তায় ছিলাম। এখন চিন্তার উপসম হল। আমার কনিণ্ঠ বোন শর্নলতা হাওরায় বেরাতে গেছে।

বর্শা বেস হয়েছে। সরত এশেছে। আপনি আশার সময় কল্যান, সঙকড়, তুশারকে সাথে নিয়ে আশবেন। শ্রাবণ মাযে খুব বৃষ্টি হয়ে চাস-বাঁশের বর উপকাড় হয়েছে। আমার প্রণাম গ্রহন করুণ।

ইতি—

আপনার স্নেহের

কল্যান বেড়া

১৮. বোধশক্তির বিচার

তোমরা যা পড়, তা কোন না কোন বিষয় সম্বন্ধে লেখা। এই লেখা পড়ে তোমাদের জ্ঞানের বিকাশ কতটা হল বা বিষয়টি তোমরা কতটা অনুধাবন করতে পারলে তার পরিমাপ করার জন্যই বোধশক্তির বিচারের প্রয়োজন হয়। একেই বলে **বোধশক্তির পরীক্ষা** Comprehension Test)।

এই বিচারেরর জন্য তোমাদের প্রথমে কোন বিষয়ের উপর লেখার কিছু অংশ পড়তে বলা হয়। তারপর ঐ লেখাটি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। ঐ প্রশ্নগুলির উত্তরের ভিত্তিতেই তোমাদের **বোধশক্তির বিচার** হয়।

নীচে বোধশক্তি বিচারের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল ঃ

১। তাঁর প্রকৃত নাম নিশার আলি। জমিদারের জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করতেন। কৃষ্ণদেব রায় নামে এক জমিদার প্রত্যেক প্রজার দাঁড়ির ওপর আড়াই টাকা করে কর বসিয়েছিল। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারও কম ছিল না। অনিচ্ছুক কৃষকদের ওপর নির্যাতন করতো। এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিতুমীর দাঁড়ালেন। হিন্দু-মুসলমান কৃষক দলে দলে তিতুর পাশে এসে দাঁড়াল। জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষ হল।

উপরের অংশটুকু ভালভাবে পড়লেই তোমরা নীচের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। যেমন, —

প্রশ্ন ঃ তিতুমীরের প্রকৃত নাম কি?

উত্তর ঃ তিতুমীরের প্রকৃত নাম নিশার আলি।

প্রশ্ন ঃ প্রজাদের দাড়ির উপর কে কর বসিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ জমিদার কৃষ্ণদেব রায় প্রজাদের দাড়ির উপর কর বসিয়েছিলেন।

প্রশ্ন ঃ প্রজাদের দাড়ির উপর কত কর বসিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ আড়াই টাকা।

প্রশ্ন ঃ কোন্ অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিতুমীর দাঁড়ালেন?

উত্তর ঃ অনিচ্ছুক কৃষকদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে।

প্রশ্ন ঃ তিতুর পাশে কারা দাঁড়িয়েছিল?

উত্তর ঃ দলে দলে হিন্দু-মুসলমান-কৃষক।

প্রশ্ন ঃ এর ফলাফল কি হয়েছিল?

উত্তর ঃ জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছিল?

২। গরু যে দুধ দেয় তা অতিশয় পুষ্টিকর। গরুর দুধ থেকে নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত

হয়। ষাঁড় লাঙ্গল টেনে কৃষকদের কাজে সহায়তা করে। ষাঁড় গাড়িও টানে। গরুর গোবর থেকে ঘুঁটে হয়। ঘুঁটে গৃহস্থের কাজে লাগে। গোবর চাষের উৎকৃষ্ট সার।

প্রশ্ন ঃ গরুর দুধ কেমন ?

উত্তর ঃ গরুর দুধ অতিশয় পুষ্টিকর।

প্রশ্ন ঃ গরুর দুধ থেকে কি প্রস্তুত হয় ?

উত্তর ঃ গরুর দুধ থেকে নানা প্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

প্রশ্ন ঃ ষাঁড় কি কি কাজে লাগে ?

উত্তর ঃ ষাঁড় গাড়ি টানে আবার লাঙ্গল টেনে কৃষকদের কাজেও সহায়তা করে।

প্রশ্ন ঃ গরুর গোবর কি কাজে লাগে ?

উত্তর ঃ গোবর উৎকৃষ্ট সার। সার চাষের কাজে লাগে। গোবর থেকে ঘুঁটে হয়। ঘুঁটে গৃহস্থের কাজে লাগে।

অনুশীলনী

নীচের অনুচ্ছেদগুলি বার বার পড়। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের নীচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও ঃ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ মাহুতের কুসুমকলিকে নিয়ে ভারি গর্ব ছিল। বাড়িতে কেউ এলে, অমনি তাকে অতিথিদের কাছে নিয়ে যেত। কুসুমকলি মাথা নিচু করে শুঁড় বাড়িয়ে তাঁদের পায়ে বুলিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নিত। মুখখানিও ছিল বড় মিষ্টি, চোখ দিয়ে মিটিমিটি হাসতো।

প্রশ্ন ঃ কুসুমকলিকে নিয়ে মাহুতের কি ছিল ?

উত্তর ঃ ... ...

... ...

প্রশ্ন ঃ কাকে অতিথিদের কাছে নিয়ে যেত।

উত্তর ঃ ... ...

প্রশ্ন ঃ কুসমকলি কার নাম ?

উত্তর ঃ ... ...

প্রশ্ন ঃ কুসুমকলি মাথা নিচু করে কি করতো ?

উত্তর ঃ ... ...

... ...

... ...

প্রশ্ন ঃ মুখখানি কেমন ছিল ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … … …

প্রশ্ন ঃ কেমন করে হাসতো ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … …

অনুচ্ছেদ—২ ঃ সূর্যের তাপে মাটি গরম হয়, তার সংস্পর্শে এসে হাওয়া গরম হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়, ঠাণ্ডা হাওয়া চারিদিক থেকে ছুটে আসে ওই খালি জায়গা দখল করতে।

প্রশ্ন ঃ মাটি কি ভাবে গরম হয় ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … …

প্রশ্ন ঃ গরম হাওয়া কোথায় যায় ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … …

প্রশ্ন ঃ ঠাণ্ডা হাওয়া কোথা থেকে ছুটে আসে ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … …

প্রশ্ন ঃ ঠাণ্ডা হাওয়া কেন ছুটে আসে ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … …

অনুচ্ছেদ - ৩ ঃ লক্ষ্মীবাঈ দশমাস মাত্র নির্বিবাদে রাজ্য শাসনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপরই আরম্ভ হল ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ। ইংরেজ সেনাপতি ঝান্সীর দুর্গ আক্রমণ করলেন। লক্ষ্মীবাঈ-এর আহবানে ঝানসীর পুরুষ ও নারী স্বদেশ রক্ষার জন্য সমভাবে অগ্রসর হল।

প্রশ্ন ঃ লক্ষ্মীবাঈ কয় মাস রাজ্য শাসন করেছিলেন ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … …

প্রশ্ন ঃ তারপর কি আরম্ভ হল ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … …

প্রশ্ন ঃ কে ঝান্সীর দুর্গ আক্রমণ করেন ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … …

প্রশ্ন ঃ ঝান্সীর আহবানে কারা অগ্রসর হন ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … …

প্রশ্ন ঃ তাঁরা কেন অগ্রসর হন ?

উত্তর ঃ … … … … … … … … … … … … … … …

১৯. পত্র রচনা

পত্রলেখার ভূমিকা ঃ

তুমি মামাবাড়ী থেকে লেখাপড়া করছো। বাবা, মা, ভাই, বোন আছে দেশের বাড়ীতে। স্কুলের ছুটিতে দেশে যাও। দেশের খবরের জন্য মন উতলা হলে তুমি কি করবে? একমাত্র চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেই এই দুশ্চিন্তা থেকে তুমি, তোমার মা-বাবা, আমরা সবাই রক্ষা পেতে পারি। এ জন্যই পত্র লেখার প্রয়োজন। সুন্দর ও সুখপাঠ্য পত্র সকলকেই আকর্ষণ করে। সেজন্য এখন থেকেই তোমাদের পত্র লেখার অভ্যাস করা দরকার।

পত্র লেখার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। সেগুলো না মেনে কেবলমাত্র সুখ-দুঃখের খবর আদান প্রদান করলেই তাকে আদর্শপত্র বলা যাবে না। সেজন্য নীচে সে নিয়মগুলো সম্পর্কে সবার আগে আমরা আলোচনা করবো।

একটি আদর্শপত্রকে মোটামুটি **সাত ভাগে** ভাগ করা যায়। যেমন,

(ক) দেবতার নাম, (খ) পত্র-লেখকের ঠিকানা, (গ) পত্র-লেখার তারিখ, (ঘ) সম্ভাষণ, (ঙ) পত্রের মূল বক্তব্য, (চ) পত্রলেখকের স্বাক্ষর, (ছ) পত্র-প্রাপকের নাম ও ঠিকানা।

কি ভাবে পত্র লিখবে ঃ

(ক) দেবতার নাম ঃ

এই অংশটি পত্রের একেবারে উপরে থাকে। হিন্দুরা সাধারণতঃ মা, ওঁ, শ্রীশ্রীহরি সহায়, শ্রীশ্রীকালী মাতা সহায় ইত্যাদি লিখে থাকে। মুসলমানেরা লেখে এলাহি ভরসা, খোদা ভরসা, হক্ক সহায়, হক্‌নাম ভরসা প্রভৃতি। **মনে রেখো,** সরকারী বা বৈষয়িক চিঠিপত্র বা কোন আবেদন পত্রে এসব লেখা হয় না।

(খ) প্রেরকের ঠিকান ঃ

পত্রের একদম উপরে ডানদিকে এই অংশ লেখা হয়। যাকে চিঠি লিখছো সে যাতে লেখকের পরিচয় বুঝতে পারে সেজনই এই অংশের প্রয়োজন।

(গ তারিখ ঃ

প্রেরকের ঠিকানার ঠিক নীচেই তারিখ লিখতে হয়।

(ঘ) সম্ভাষণ ঃ

এই অংশ পত্রের বাঁ দিকে বিষয়বস্তু লেখার ঠিক উপরে লিখতে হয়। যাকে চিঠি লিখছো তার সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে সম্ভাষণ লেখা হবে। হিন্দুরা পূজনীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে শ্রীচরণকমলেষু,

শ্রীচরণেষু লেখে। আত্মীয়জন এমন ব্যক্তিকে মাননীয়েষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভৃতি লেখে। যে স্নেহের পাত্র তাকে লেখে স্নেহাস্পদেষু, কল্যাণীয়েষু। বন্ধুকে লিখবে-প্রিয়বরেষু, সুহৃদ্বরেষু প্রভৃতি। মুসলমান সম্প্রদায়েরও বিশেষ বিশেষ রীতি আছে। যেমন - পূজনীয় ব্যক্তিকে পাকজনাবেষু, বখেদমতেষু, প্রভৃতি আর বয়সে ছোট প্রিয়জনকে লিখবে—ভাইজান, দোয়া, বাপজান প্রভৃতি।

(ঙ) মূল বিষয় :

এই অংশই সব থেকে বড় আর প্রয়োজনীয়। এই অংশ পত্রের মাঝখানে লিখতে হয়। এখানেই লেখা হয় লেখকের মূল বক্তব্য। দূরের লোককে মুখে কিছু জানাবার উপায় নেই বলেই পত্র এমনভাবে লিখবে যেন, তুমি যাকে পত্র লিখছো সে যেন অতি সহজেই তোমার কথা বুঝতে পারে। এই অংশেই পূজনীয় ব্যক্তিকে প্রণাম, বা নমস্কার, অল্পবয়সীকে আশীর্বাদ, বন্ধুকে শুভেচ্ছা প্রভৃতি জানাতে হয়।

(চ) স্বাক্ষর :

এই অংশ থাকে পত্রের একেবারে ডানদিকে শেষে। পূজনীয়দের ক্ষেত্রে লেখা হয়—প্রণতঃ, স্নেহধন্য, সেবক, চরণাশ্রিত। শুভার্থী, আশীর্বাদক, শুভানুধ্যায়ী। বন্ধু-বান্ধবদের লিখতে হয় — প্রীতিমুগ্ধ, একান্ত অনুরক্ত, প্রীতিধন্য ইত্যাদি।

(ছ) প্রাপকের নাম ও ঠিকানা :

এই অংশ খুব সর্তকতার সঙ্গে লিখতে হয়। কারণ, নাম, ঠিকানা স্পষ্ট করে না লিখলে পত্র ঠিক ঠিক স্থানে পৌঁছবে না।

প্রাপকের নামের আগেও কিছু লেখার রীতি আছে। যেমন, হিন্দুরা পূজনীয়দের ক্ষেত্রে লেখে— পরমপূজনীয়, পরমারাধ্য, স্নেহজনকে লেখে - কল্যাণীয়, স্নেহাস্পদ প্রভৃতি। মুসলমান ধর্মের লোকেরা পূজনীয় ব্যক্তির নামের আগে লেখে— বখেদমতে, জনাব, ফয়েজমাব ; স্নেহজনকে — নুরচশম প্রভৃতি।

সাধারণতঃ আমরা যে সব চিঠি-পত্র লিখি, সেগুলোকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন -

১। ব্যক্তিগত চিঠি— আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে লেখা হয়।

২। ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠি।

৩। সরকারী বা বেসরকারী অফিস সংক্রান্ত চিঠি।

৪। নানা অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণের চিঠি ।

৫। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য চিঠি।

কয়েকটি আদর্শ পত্রের উদাহরণ

॥ হিন্দু রীতি ॥

১। পিতার নিকট পুত্রের পত্র ঃ

শ্রীশ্রীকালীমাতা

৮এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯
১০।১১।৮৭

শ্রীচরণকমলেষু,

পূজনীয় বাবা,

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। বাড়ির সকলে ভাল আছে। দাদুর শরীর আগের চেয়ে এখন অনেক ভাল।

আগামী ডিসেম্বর মাসে আমার বাৎসরিক পরীক্ষা শুরু হবে। পরীক্ষার জন্য আমি ভালভাবে তৈরি হয়েছি। এজন্য আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।

আপনার শরীর বর্তমানে কেমন আছে জানাবেন। দাদুর চিকিৎসার জন্য সম্ভব হলে কিছু টাকা পাঠাবেন। এখানে আমরা সকলেই ভাল আছি।

ইতি—
প্রণতঃ
প্রভাত

ডাক টিকিট

পরমপূজনীয়
শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়
৩৬, হিলকার্ট রোড,
পোঃ—শিলিগুড়ি
দার্জিলিং।

২। ছোট বোনকে লেখা পত্র ঃ

শ্রীশ্রী মা

১০, বি. টি রোড
কলিকাতা-২
৩।১।৮৮

কল্যাণীয়া

মিতা,

তুমি বাড়ি থেকে মামা বাড়ি যাওয়ার পর আমাদের সকলেরই মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পারো বাড়ি চলে এসো। তুমি এলেই আমরা পুরী বেড়াতে যাওয়ার দিন ঠিক করবো। আমরা পুরীর সমুদ্র দেখবো, দেখবো জগন্নাথের মন্দির, কোণারকের সূর্যমন্দির আরো কত কি! আমার মনে হচ্ছে—আজই যদি পুরী যেতে পারতাম কতই আনন্দ হতো।

দাদু, দিদিমা ও মামা-মামিদের আমার প্রণাম দিও। এখানে আমরা সকলে ভাল আছি। পত্রের উত্তর দিও। ইতি—

আশীর্বাদক
তোমার বড়দা

৩। মাতার নিকট কন্যার পত্র ঃ

গ্রাম + পোঃ— রাজচন্দ্রপুর
জেলা—হুগলী
৪।১।৮৭

শ্রীচরণকমলেষু,

মা,

তুমি আমার প্রণাম নিও। ভাই ও বোনকে আমার স্নেহাশীস দিও। তোমার পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার জন্য বাবার চিন্তার কোন কারণ নেই। আমাদের এই হোষ্টেলে আরও অনেক মেয়ে থাকে তারা সকলেই দূরদূরান্ত থেকে এসেছে। তারা যদি লেখাপড়ার জন্য বাবা-মাকে ছেড়ে থাকতে পারে তা হলে আমিই বা কেন পারবো না!

পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাবো। এখানে লেখাপড়ার সঙ্গে শরীর চর্চা, উপাসনাও আমাদের করতে হয়। আমি এখানে ভালই আছি। বাবাকে আমার প্রণাম জানিও। ইতি—

তোমার আদরের
মীনা

৪। বন্ধুর নিকট বন্ধুর পত্র ঃ

মৃণাল সুর
১, শেঠবাগান প্লেস
কলিকাতা-৩০
৫।১০।৮৭

প্রিয় দেবু,

আশা করি তুমি ভাল আছ। মাসিমাকে আমার প্রণাম দিও। আগামী ২০।১০।৮৭ তারিখে আমার জন্মদিন। ঐদিন আমার আরও কয়েকজন বন্ধু আমাদের বাড়িতে আসবে। তোমার নিমন্ত্রণ রইল। তুমি এলে খুব আনন্দ পাবো।

অর্ধবার্ষিক পরীক্ষাতো হয়ে গেছে। সুতরাং না আসার কোন কারণই থাকতে পারে না। আমরা সকলে ভাল আছি। তুমি এলে মা-বাবাও খুব খুশি হবেন। ইতি—

তোমার মৃণাল

৫। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট পত্র ঃ

মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়,
হেয়ার স্কুল, কলিকাতা।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

প্রণামান্তে নিবেদন এই যে, গত ১০ জুন থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি। কারণ, ঐ কয়দিন আমি আমার দাদার সঙ্গে শিলঙ-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেজন্য আমাকে উক্ত অনুপস্থিতির দিনগুলির ছুটি মঞ্জুর করলে বিশেষ বাধিত হব। পূর্ব অনুমতি নিতে না পারার জন্য আমাকে মার্জনা করবেন।

ইতি—
আপনার অনুগত ছাত্র
কৌশিক মিত্র, পঞ্চম শ্রেণী

১০২, টেমার লেন,
কলিকাতা -৯।
১৬ই জুন, ১৯৮৭

৬। পুস্তক বিক্রেতাকে পুস্তক পাঠাবার অনুরোধ ঃ

শ্রীইন্দ্রজিৎ সেন
C/o. শ্রীযুক্ত বাসুদেব সেন
১০, বেনারস রোড, হওড়া
১৬।১২।৮৭

মাননীয় কর্মাধ্যক্ষ
আশা বুক এজেন্সী
৮এ, কলেজ রো,
কলিকাতা—৯

মহাশয়,

আপনাদের প্রকাশিত পঞ্চম শ্রেণীর 'বিশ্ববরেণ্য' বইখানি এক কপি ভি. পি. করে উপরের ঠিকানায় পাঠালে বাধিত হব।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাবেন। কারণ, আগামী ১০।১।৮৮ থেকে আমাদের নূতন শ্রেণীর শুরু হবে।

ধন্যবাদান্তে—
নিবেদক,
ইন্দ্রজিৎ সেন

॥ মুসলমান-রীতি ॥

৭। মাতার নিকট কন্যার পত্র ঃ

হবিব সহায়

ঠিকানা..............
তাং..... ....

আদাব তস্‌লিমত হাজার হাজার সালামবাদ আরজ—এই

আম্মাজান বহুদিন যাবৎ আপনার কোন খবর না পাওয়ায় আমি খুব চিন্তায় আছি। পত্র পাওয়া মাত্র আপনাদের কুশল লিখে আমাকে সুখী করবেন।

আকবরের মাদ্রাসায় আমার ভর্তির চেষ্টা চলছে, এখনও কোন সুবিধা হয় নি। খোদার দোয়ায় আমরা এখানে ভাল আছি। আব্বাজানকে আমার হাজার হাজার আদাব জানাবেন। অতি সত্বর পত্রের উত্তর দিবেন।

ইতি—
ফিদবি
স্নেহের আয়েশা

৮। পিতার নিকট পুত্রের পত্র ঃ

খোদা ভরসা

ঠিকানা...........
তাং...............

পাকজনাবেষু,

আব্বাজান, খোদার ফজলে এখানে আমরা খোস তবিয়তে আছি। দুই এক রোজের মধ্যেই আমাদের মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি পরীক্ষা ভালই দিয়েছি। খাদেমের আরজ এই যে, আব্বাজান, এইবার আমি খালাত ভাই আমিনের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাব। আশা করি আর্জি মঞ্জুর করবেন। পত্রের উত্তর দেবেন। আপনার তবিয়ৎ কেমন জানাবেন। হাজার হাজার সালাম পৌঁছে।

ইতি—
খাদেম রসুল

অনুশীলনী

১। পত্র-লেখার জন্য কি কি নিয়ম পালন করা উচিৎ ?

২। তুমি কোন মেলা দেখে এসেছো—তার বিবরণ জানিয়ে বন্ধুকে পত্র লেখ।

৩। গত পূজার ছুটি কিভাবে কাটিয়েছো তার বিবরণ লেখ বন্ধুকে।

৪। বাড়িতে টি. ভি কেনা হয়েছে—এই সংবাদ দিয়ে দিদিকে পত্র লেখ।

৫। স্বরস্বতী পূজার বর্ণনা দিয়ে পত্র লেখ মামাকে।

৬। বনভোজনের বর্ণনা দিয়ে পত্র লেখ ছোট ভাইকে।

৭। অর্ধদিবস ছুটি প্রার্থনা করে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে একটি পত্র লেখ।

৮। মায়ের অসুখের খবর জানাও দাদাকে।

৯। বই কেনার জন্য টাকা চেয়ে পত্র লেখ বাবাকে।

১০। তোমার জ্বর হয়েছিল এখন ভাল আছো সেই সংবাদ জানিয়ে পত্র লেখ মাকে।

অনুচ্ছেদই হল রচনার প্রথম সোপান। যে কোন রচনার একটিমাত্র অংশে যেসব বক্তব্য লেখা হয় তাকেই বলে অনুচ্ছেদ লিখন। এই অনুচ্ছেদকেই ইংরেজীতে বলা হয় Paragraph.

প্রবন্ধ বা অনুচ্ছেদ তুমি যা-ই লেখ না কেন সেজন্য তোমাকে নিয়মিত অনুশীলন করতেই হবে। নীচের আলোচনাগুলো মনে রেখে অভ্যাস করলে তুমি ভাল লেখার অধিকারী হবে।

১। যে সম্পর্কে অনুচ্ছেদ বা প্রবন্ধ লিখতে চাও সে বিষয় আগে চিন্তা করে নেবে ;

২। কোন্‌টা আগে বা কোন্‌টা পরে লিখবে সে সম্পর্কে সচেতন হবে ;

৩। নূতন ভাব বা বক্তব্য আলাদা অনুচ্ছেদে লিখবে ;

৪। সাধু বা চলিত যে কোন ভাষায় লিখতে পার। কিন্তু কখনও সাধু ও চলিত ভাষা একসঙ্গে মিশিয়ে লিখবে না ;

৫। যে শব্দের অর্থ পরিষ্কার নয় তা ব্যবহার করবে না। ভাষা সহজ, সুন্দর হবে। বানান ভুল এড়াবার চেষ্টা করে নির্ভুল বাক্য লিখতে চেষ্টা করবে।

৬। একই কথা বারবার লিখবে না। হাতের লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর করার চেষ্টা করবে।

৭। নিজের মনের কথা ভাল ও সুন্দর করে লিখতে শেখাই রচনার উদ্দেশ্যে। অন্যের অনুকরণ না করে নিজের চেষ্টায় ছোট ছোট বাক্য দিয়ে লেখার অভ্যাস করবে।

নীচে কয়েকটি আদর্শ অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনার নমুনা দেওয়া হ'ল ঃ

বিদ্যালয় [সাধু ভাষায়]

যে গৃহে বসিয়া আমরা অধ্যয়ন করিয়া থাকি তাহাকে বিদ্যালয় বলা হয়। এই স্কুলে আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারি। শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের স্নেহ এবং বিদ্যাদেবীর আশীর্বাদ পাই। তাই ইহা আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ইহাই আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতেছে। আমাদের বিদ্যালয়টি দুই তলা এবং পুরোনো। দশম শ্রেণী পর্যন্ত রহিয়াছে। আমাদের বিদ্যালয়ে ছোট্ট একটি পাঠাগার রহিয়াছে। তাছাড়া অফিস ঘর, প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বসিবার ঘর এবং অন্যান্য শিক্ষক মহাশয়দের বিশ্রাম-কক্ষ। বিদ্যালয়ের পশ্চাতে একটি মাঠ এবং একপাশে ফুলের বাগান। বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি থাকে অন্য একটি ঘরে। প্রায় তিনশত ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করে। শিক্ষক মণ্ডলী আমাদের খুব ভালোবাসেন, ভুল সংশোধন করিয়া দেন ও অন্যায় কাজকর্মের জন্য শাস্তি দেন।

বিদ্যালয়ে নানা উৎসব পালিত হয়। উৎসবের দিনগুলিতে আমরা ফুল-মালা দিয়া সাজাই। ২৬শে জানুয়ারী এবং ১৫ই আগষ্ট বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশেষ দিনগুলিতে আমরা সভারও আয়োজন করিয়া থাকি। খেলাধুলা এবং পড়াশুনার মধ্য দিয়া আমরা প্রত্যেকেই উচ্চতর শ্রেণীতে উঠি। মানুষের মতোই মানুষ হইবার শিক্ষা আমরা বিদ্যালয় হইতে লাভ করি, তাই তার কাছে আমরা চিরঋণী।

খবরের কাগজ [সাধু ভাষায়]

যে কাগজের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রকমের খবর জানাতে পারি তাহাকে খবরের কাগজ বলা হয়। ইহাতে দেশের এবং বিদেশের খবর থাকে। ইহা নিত্যনতুন খবর লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়।

খবরের কাগজে ক্রীড়া-অনুরাগীরা ক্রীড়ার প্রতি, রাজনীতিবিদেরা রাজনীতির প্রতি, চলচ্চিত্র অনুরাগীরা চলচ্চিত্রের প্রতি এবং বেকারেরা কর্মখালির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। কবে, কোথায় এবং কেন বন্ধ তাহা আমরা ইহার মাধ্যমে জানিতে পারি। ব্যবসায়ীরা ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। ইহার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময়সূচী জানতে পারি। বর্তমান সভ্যতা অধিকাংশই খবরের কাগজের উপর নির্ভরশীল। খবরের কাগজের উপর ভিত্তি করিয়া আমরা অনেক সময়েই অনেক কাজকর্ম করিয়া থাকি।

বিদ্যুৎ [সাধু ভাষায়]

বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের একটি অন্যতম আবিষ্কার। বেনজামিন্ ফ্র্যাংকলিন ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইহার প্রচলন ব্যাপক এবং সর্বত্র।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিদ্যুতের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইহা আমাদের অতিরিক্ত সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ইহার সাহায্যে আমরা আজ অতিরিক্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করি। ইহা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে অনেকাংশেই সাহায্য করিয়া থাকে। শিল্পক্ষেত্রে, চিকিৎসাক্ষেত্রে, পরিবহন ক্ষেত্রে এমনকি শিক্ষা ক্ষেত্রেও ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে কৃষিকর্মেও ইহা ব্যবহার করা হইতেছে। সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে এবং আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অবদান অপরিসীম।

কোকিল

কোকিল দেখতে কালো। একে আমরা বসন্তের দূতও বলি। কারণ, এরা বসন্তের সময় আসে আবার বসন্তের শেষে চলে যায়। এরা বসন্তকাল ভালোবাসে। তাই যখন যেখানে বসন্তকাল শুরু হয়, কোকিল তখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়।

এদের ডাক খুব মিষ্টি। এরা কুহু কুহু সুরে ডাকে। কেবল বসন্তকালেই আমরা এদের ডাক শুনতে পাই। অন্য ঋতুতে এদের ডাক শোনা যায় না। এরা নিজস্ব কোনো বাসা তৈরি করে না। এরা ভীষণ চালাক। এরা কাকের বাসায় ডিম পাড়তে ওস্তাদ। কারণ, কোকিলের ডিম আর কাকের ডিম প্রায় একইরকম। তাই কাক নিজের ডিম ভেবেই যত্ন করে, তা দেয় এবং বাচ্চা ফোটায়। তারপর সেই বাচ্চা একটু বড় হলেই কুহু কুহু ডাক ছেড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কাক বোকা বনে যায়।

আমাদের শহর

আমরা যেখানে বসবাস করছি তার নাম কলিকাতা মহানগরী। সুতরাং কলিকাতা আমাদের শহর। এই শহরের একটি পুরোনো ইতিহাস আছে। বহুদিন আগে এই শহরটা তিনটি গ্রামে পরিচিত ছিল। যথা —সুতানুটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর। পরে জব চার্ণক নামক একজন ইংরাজ এখানে ব্যবসা করতে আসে এবং নিজেদের স্বার্থে দুর্গ নির্মাণ করে। এমনি করেই ধীরে ধীরে ঐ তিনটি গ্রাম শহরে রূপান্তরিত হতে থাকে। বর্তমানে কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। এর আয়তন বর্তমানে প্রায় ৩৬ বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা যাট লক্ষের কাছাকাছি। কলিকাতা ভারতের অন্যতম শিল্প এবং বাণিজ্যকেন্দ্র। সমুদ্র পথে এবং বিমান পথে পৃথিবীর সর্বত্র যোগাযোগ করার সুব্যবস্থা এখানে আছে। এখানে দেখার মতো বহু জায়গা আছে। যেমন, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ,

যাদুঘর, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, বেতার কেন্দ্র, আইন সভা, গড়ের মাঠ, শহীদ মিনার, রবীন্দ্র সদন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরো অনেক কিছু।

এটি শুধু শিল্প, বাণিজ্য এবং পর্যটন কেন্দ্রই নয়, এটি একটি শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্রও। এখানে বহু মহাপুরুষ জন্মেছেন এবং এখানেই তাঁদের কর্মস্থান ছিল।

এখানকার রাস্তাঘাট আলোয় ঝলমল করে। বিভিন্ন রকমের দোকানপাট, রকমারী জিনিস, বিভিন্ন যানবাহনে কলিকাতা অর্থাৎ আজ আমাদের শহর কর্মকলাহলমুখর।

শরৎকাল

ছয়টি ঋতুর একটি হচ্ছে শরৎকাল। ভাদ্র ও আশ্বিন এই দু'মাস শরৎকাল। বর্ষা যখন বিদায় নিতে থাকে আমরা তখন শরৎকালের আগমনী গান গাই। পরিষ্কার আকাশে ছেঁড়া তুলোর মতো কিছু মেঘ দেখা যায়। নদী-নালা খাল-বিল বর্ষার জলে সব পরিপূর্ণ। ধানক্ষেতে সবুজের সমারোহ। উজ্জ্বল আলো এবং মৃদুমন্দ বাতাসে ধানের শিষগুলিকে দেখলে মনে হয় যেন আনন্দে দুলছে। রাত্রে নির্মল জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে ওঠে। তখন গ্রামগুলিকে মনে হয় যেন স্বপ্নে দেখা রূপকথার দেশ।

এই সময়ে শিউলি গাছের তলা শিউলি ফুলে ভরে যায়। দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে প্রভৃতি পাখির গুঞ্জন শোনা যায়। সে যেন এক অপরূপ শোভা। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা এই শরৎকালেই। ঘরে ঘরে তখন আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। ছোট বড়ো সবাই নতুন সাজে সজ্জিত হয়। প্রবাসীরা এই সময়ে দেশে ফেরে। একে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সে এক মহানন্দ। এই আনন্দের মাঝেও কিছু দুঃখ আছে। কারণ, বর্ষার পর শরৎকালে নানা রকম সংক্রামক ব্যাধি দেখা দেয়। কখনও বৃষ্টির জের পূজার সব আনন্দ নষ্টও করে দেয়।

সরস্বতী পূজা

সরস্বতী শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই এটা শিক্ষার্থীদের পূজা। এই পূজা মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে হয়। প্রত্যেক শিক্ষাস্থানে, বাড়িতে ও বারোয়ারিভাবে পাড়ায় পাড়ায় এই পূজা হয়।

দেবী শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, বীণা বাদনরতা। দেবীর বাহন হংস। পূজার আগে থেকেই চলে সাজসাজ্জার পালা। পূজার দিন শিক্ষার্থীরা দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তবে উপবাস ভঙ্গ করে। নতুন পোশাকে ছেলেমেয়েরা পূজা দেখতে বেড়োয়। সে কী আনন্দ। অনেক সময় এই উপলক্ষে গান-বাজনা থিয়েটার প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। শহরে এবং গ্রামে আমরা এই পূজা দেখতে, পাই, পূজার শেষে দেবীকে আমরা বিসর্জন দিয়ে আসি। ফিরে আসার সময় আমাদের মন দুঃখে ভরে ওঠে। নতুন বর্ষের পড়াশুনায় আমরা আবার মনোনিবেশ করি।

ফুটবল খেলা

খেলতে আমরা সবাই ভালোবাসি। কেউ কম কেউ বেশী। ফুটবল পায়ের খেলা। এই খেলার একটা আলাদা উত্তেজনা আছে। একটা টেনশন আছে। তাই এটা আমাদের একটি প্রিয় খেলা। এই খেলাকে ঘিরে শুরু হয় অনেক হানাহানি, মারামারি। তবু এই খেলার আনন্দে আমরা মুখরিত, উল্লসিত, বিজয়ীদল এবং তার সমর্থকেরাও। বিশ্বকাপ ফুটবল এই খেলার একটি অন্যতম প্রতিযোগিতা। প্রথম এই খেলা শুরু হয় ১৯৩০ সালে। যে কাপটি বিজয়ীদলকে দেওয়া হয় তার নাম 'জুলে রিমে কাপ'। একে আবার সোনার পরীও বলে। বিশ্বকাপ ফুটবল আসর থেকেই আমরা নামী-দামী খেলোয়াড়দের নাম জানতে পারি। টেলিভিসনের পর্দায় দেখতে পারি তাদের মনভোলানো খেলা। ব্রাজিলের পেলে, ইংলণ্ডের ববি মুর, পশ্চিম জার্মানির বেকেন বাউয়ার এবং আরজেন্টিনার দিয়াগো মারাদোনা ও আরো অনেক বিশ্বের সব নামকরা খেলোয়াড়।

কুকুরের প্রভুভক্তি [সাধু ভাষায়]

মানুষ বিভিন্ন জীবজন্তু পোষে; তাহাদের মধ্যে অন্যতম কুকুর। কারণ, কুকুর বুদ্ধিমান এবং প্রভুভক্ত জীব। অনেকে বলেন, সবার আগে কুকুর মানুষের পোষ মানিয়াছিল। ইহারা স্তন্যপায়ী এবং মাংসাশী জীব। যে তাহাকে আদর করে, খাদ্য দেয়, সে তাকে কোনোদিন ভোলে না। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও ইহারা প্রভুর জীবন বাঁচায়। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি এবং শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। ইহাদের ঘুম গভীর হইলেও অতি সামান্য শব্দেই আবার জাগিয়া ওঠে। ইহারা রাত্রি জাগিয়া প্রভুর বাড়ি পাহারা দেয়। ইহারা প্রভুর সামান্য ইঙ্গিতও বুঝিতে পারে। ইহারা খুব বিশ্বস্ত। ইহারা প্রভুর পরিবার এবং পরিজন, সবাইকেই যথেষ্ট ভালোবাসে।

ফুল

পৃথিবীর নানা দেশে নানা রংয়ের এবং নানা নামের ফুল আমরা দেখতে পাই। এর আদর পৃথিবীর সর্বত্র। এমন লোক পৃথিবীতে একটিও নেই যে ফুল ভালোবাসে না। ভারত যেন ফুলের বাগান। এখানে গোলাপ, পদ্ম, জুঁই, চাঁপা, রজনীগন্ধা, শিউলি এবং আরো অনেক রকমের ফুল দেখতে পাই। প্রত্যেক ফুলের আবার আলাদা আলাদা গন্ধ আছে। সেই গন্ধে আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

এই ফুল মানুষের বিভিন্ন কাজে লাগে। বিভিন্ন দেব-দেবীকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ফুলে

অঞ্জলি দিয়ে থাকি। আনন্দ-উৎসবে অথবা অসুস্থ প্রিয়জনকে যোগ্য সম্মান জানানোর জন্য আমরা ফুল দিয়ে থাকি। এই ফুল থেকেই ফলের সৃষ্টি আবার ফল থেকেই গাছ আবার সেই গাছ থেকেই ফুল হয়। কোনো কোনো ফুল দিনে আবার কোনো কোনো ফুল রাত্রে ফোটে।

॥ প্রবন্ধ রচনার কয়েকটি উদাহরণ ॥

রবীন্দ্রনাথ [সাধুভাষায়]

২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ সালে কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা ছিলেন সারদা দেবী। তাঁহার পিতামহ ছিলেন দ্বারকানাথ যিনি বাংলাদেশের একজন অন্যতম ধনী ব্যক্তি। তাঁহাকে প্রিন্স বলিয়া ডাকা হইত। এই পরিবার ছিল শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, অভিনয় ও চিত্রকলার একটি অন্যতম কেন্দ্র। শৈশবেই তিনি কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। যদিও তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন তথাপি বাড়িতেই তিনি বেশি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সংগীতের চর্চা করিতেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সেই একটি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার লেখা কবিতা বাহির হইয়াছিল। ক্রমেই তাঁহার প্রতিভা ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। তিনি একজন সাহিত্যিক এবং কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা খুব ভালো করিয়া শিখিয়াছিলেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি শুধু কবি নন, একজন দেশপ্রেমিকও। তাঁহার গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে দেশপ্রেমের জোয়ার বহিয়াছিল। শান্তিনিকেতনে তিনি বিশ্বভারতী স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশ ও বিদেশের বহু শিক্ষার্থী এখনও সেখানে পড়িতে আসে। তাঁহার নাম বাংলায় অমর হইয়া থাকিবে। তিনি ভারতের গৌরব—বাঙালীর গৌরব। ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ জোড়াসাঁকোর বাসভবনে এই মহাকবির দেহাবসান হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর [সাধুভাষায়]

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১২ই আশ্বিন ১২২৭ সালে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম

ভগবতী দেবী। তাঁহার মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী আজও বিরল। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। নয় বৎসর বয়সে তিনি গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় থাকাকালীন একই সঙ্গে তিনি লেখাপড়া এবং সংসারের কাজকর্ম করিতেন। অর্থাভাবে তাঁহাকে রাস্তার আলোতেও পড়িতে হইত। পরবর্তীকালে তিনি সুপণ্ডিত হইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, একদা কলেজের অধ্যক্ষও হইয়াছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক, দানবীর, শিক্ষা-সংস্কারক, এমনকি মানব দরদীও ছিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে 'দয়ারসাগর'ও বলা হইত। তিনি মাতৃভক্ত ছিলেন। শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি 'বোধোদয়', 'শকুন্তলা,' 'ভ্রান্তিবিলাস' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া ছিলেন। তিনিই প্রথম বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বাল্য বিবাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার বাহির দিকটি ছিল ইস্পাতের মতো কঠিন আবার ভিতরের দিকটি ছিল ফুলের মতো কোমল। ১৩ই শ্রাবণ ১২৯৮ সালে এই মহামানবের জীবন দীপ নির্বাপিত হইয়াছিল। বাঙালী মাত্রেই তাঁহাকে চিরদিন মনে রাখিবে।

ভগিনী নিবেদিতা [সাধুভাষায়]

ভারতে আসিয়া যে-সমস্ত বিদেশীরা এই দেশকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন একজন। তিনি এই দেশের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার আসল নাম মার্গারেট নোবেল। ইনি একজন শিক্ষিতা। স্বামীজী যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন তখন তিনি এই মার্গারেটের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনিই মার্গারেটকে এই দেশে লইয়া আসেন। দীক্ষার সময় স্বামীজী তাঁহাকে এই নামে ভূষিত করিয়াছিলেন। 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামক একটি বিদ্যালয় নিবেদিতারই প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইংরাজীতে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর কিছু কিছু মৌলিক গবেষণা করিয়া কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আজীবন ভারতের প্রকৃত রূপটি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাধিকা জীবন অতি দীন হীনভাবে কাটাইতে হইত। এই মহীয়সী ১৩ই অক্টোবর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

পরাধীন ভারতের সর্বত্যাগী মহান নেতা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এই দেশে বহু নেতা জন্মেছেন কিন্তু নেতাজীর মতো সম্মান কেউ লাভ করেননি। তিনি ছিলেন সমগ্র জাতির মুক্তির পূজারী, স্বাধীনতার পথনির্দেশক। ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার কটক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁহার পিতার নাম জানকীনাথ বসু এবং মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। কটকের 'র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে' তিনি প্রথম লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করে বেড়াতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় ওটেন নামক একজন ইংরাজ অধ্যপক ভারতীয়দের সম্বন্ধে অপমান-কর উক্তি করায় তিনি তার প্রতিবাদে সেই অধ্যাপককে প্রহার করেন এবং এই অভিযোগে কলেজ থেকে বিতাড়িত হন। পরবর্তী কালে তিনি স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লাভ করেন। এর পর তিনি বিলাত থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে দেশে ফেরেন। দেশে ফিরে তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন নি। স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। নানা কারণে তাঁহাকে বহুবার জেলে যেতে হয়েছিল। 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি দল তিনি গঠন করেন। ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪১ সালে স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হন। তিনি জাপানে গিয়ে আজাদ-হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং ইম্ফল পর্যন্ত আক্রমণ চালান। ১৯৪৫ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে। তাঁহার দেশপ্রেম, সংগঠনিক ক্ষমতা এবং তেজস্বীতার জন্য তিনি ভারতের অমর নেতা।

স্বামী বিবেকানন্দ

মানবদরদী বিশ্বপ্রেমিক হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ সালে (ইংরাজী) ১২ই জানুয়ারী উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ। তাঁর পিতা ছিলেন বিশ্বনাথ এবং মাতা ছিলেন ভুবনেশ্বরী। তিনি বি. এ. পাশ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন তার গুরু। পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাসী হন এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে অভিহিত হন। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। তিনি বলতেন সকল মানুষই এক ভগবানের পুত্র। ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় যে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন হয় তাতে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। এই সময়ে বহু মার্কিন এবং ইউরোপীয় তাঁর শিষ্য হন। মার্গারেট নোবেল তাঁর

একজন অন্যতম শিষ্যা যিনি পরে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে পরিচিত হন। ১৮৯৭ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। আজ এই মিশনের বহু শাখা প্রশাখা হয়েছে। বহু লোক এই মিশনের ভক্ত। তাঁর রচিত বহু বই-পত্র আছে যাতে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার কথা প্রকাশ পায়। তিনি বলতেন, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তিনি ছিলেন প্রাচ্য এবং পশ্চাত্যের মিলনসেতু। ৪ঠা জুলাই ১৯০২ সালে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

প্রাণীবিষয়ক প্রবন্ধ

গোরুর উপকারিতা

গোরু গৃহপালিত পশু। গোরুকে আমরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করি। গোরু স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ প্রাণী। গোরুকে সহজেই পোষ মানানো যায়। ইহারা সাধারণতঃ হাত পাঁচেক লম্বা হয়। বিভিন্ন রংয়ের লোম দ্বারা ইহাদের সারা দেহ আবৃত। শিং দ্বারা ইহারা শত্রুদের আক্রমণ করে। ইহাদের পায়ের ক্ষুরগুলি চেরা। ইহারা লেজের সাহায্যে মাছি তাড়াইয়া থাকে। খড়-বিচালি, ভুষি এবং ঘাস ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহা ছাড়া খইল, ভাতের ফেন, পাতা ইত্যাদিও খাইয়া থাকে। ইহারা প্রথমে খাদ্য গিলিয়া অবসর সময়ে ধীরে ধীরে তাহা মুখের মধ্যে আনিয়া চর্বণ করে। ইহাকে 'জাবর কাটা' বলে। কৃষিপ্রধান দেশে পুরুষ-গোরু দ্বারা চাষ করা হয়, গাড়ি টানানো হয়, বোঝা বহানো হয়। মেয়ে-গোরু আমাদের দুধ দেয়। দুধ একটি আর্দশ পুষ্টি এবং শিশুদের প্রধান খাদ্য। গোরুর গোবর সাররূপে ব্যবহার হয়। ইহাদের চামড়ায় জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ বিষয়ক প্রবন্ধ

পাট গাছ

ভারতের অন্যতম অর্থকরী ফসল পাট। পাট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। নদীবহুল পলিমাটি বাহিত জমিতে প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে জমিতে পাটের বীজ বোনা হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে একটু বড় হলে কেটে জলে ভেজানো হয়। তারপর পচে যাওয়ার পর ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে কাঠিটিকে জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা হয়। এইগুলিকে পাটকাঠি বা প্যাকাঠি বলা হয়। বাংলাদেশ এবং ভারতেই সবচেয়ে বেশী পাট উৎপাদন হয়। পাটের তন্তু থেকে দড়ি, থলে, গালিচা, শৌখিন বস্ত্র প্রভৃতি তৈরি করা হয়। এ ছাড়াও জ্বালানী এবং ঘরের ছাউনির কাজে প্যাকাঠি ব্যবহার করা হয়। পাট থেকে সরু চট তৈরি করা হয়। বিভিন্ন প্রকার পাটজাত দ্রব্য ভারত আজ বিদেশে রপ্তানি করে। ৯৯টি চটকল পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। বহুলোক পাট চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

নারিকেল গাছ

সমুদ্র উপকূলে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল গাছ দেখা যায়। বেলে এবং নোনা মাটি এই গাছের পক্ষে অনুকূল। কেরল এবং তামিলনাড়ুতে ভারতের সবচেয়ে বেশি নারিকেল গাছ জন্মায়। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুরেও এই গাছ কিছু কিছু দেখা যায়। নারিকেলের উপরে ছোবড়া, ভিতরে জল ও শাঁস থাকে। ঝুনা নারিকেলের শাঁস এবং কচি ডাবের জল খাইতে সুস্বাদু। ইহার শাঁস হইতে বিভিন্ন রকমের সুস্বাদু খাদ্য তৈয়ারী হয়। বিভিন্ন পূজাতেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার ছোবড়া হইতে দড়ি; নানা ধরনের পা-পোষ বিছানার গদি প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। ইহার পাতা ঘরের চাল হিসাবে এবং পাতার কাঠি বাঁধিয়া ঝাঁটাও তৈয়ারী হয়। ইহার শাঁস হইতে তৈল বাহির করিয়া খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহারা বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। ইহারা পঞ্চাশ-ষাট হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের কোনো অংশই ফেলা যায় না।

গ্রীষ্মকাল

বসন্তের বিদায় লগ্নে কোকিলের ক্লান্ত কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া আসে। বাংলার প্রকৃতিতে আবির্ভাব হয় রুদ্র চক্ষু গ্রীষ্মের। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মকালে নিদারুণ উত্তাপে নদী-নালা, খালবিল শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার ফলে নানা স্থানে জলের অভাব দেখা দেয়। ঘোলা এবং দূষিত জল পান করিয়া নানা প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হয়। মাঠ-ঘাট মরুভূমির মত ধূ ধূ করে। গাছপালা বিবর্ণ রূপ ধারণ করে। এই সময় দ্বিপ্রহরে কোন প্রকার কাজকর্ম করিতে ভালো লাগে না। গলা-বুক পিপাসায় শুকাইয়া যায়। শরীর হইতে ঘাম ঝরে। তথাপি ইহার একটি স্নিগ্ধ দিক রহিয়াছে। কাল-বৈশাখীর সজল ধারা বর্ষণে, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস প্রভৃতি প্রচুর ফল জন্মায়। গ্রীষ্মের সন্ধ্যাটি অত্যন্ত রমণীয়। প্রখর সূর্যকিরণে বহু রোগ জীবাণু এই সময়ে মরিয়া যায়। ফলে আমরা কিছুটা রোগ হইতে মুক্তি পাই।

দুর্গাপূজা

বার মাসে তের পার্বণ হিন্দুদের নিকট অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। তথা শরৎকালের দুর্গাপূজা বাঙালীদের নিকট অত্যন্ত আনন্দময় একটি উৎসব। আমরা জানি, কেবল মাত্র একনাগাড়ে কাজ করিয়া কেহ বাঁচিতে পারে না, মাঝে মাঝে আনন্দেরও প্রয়োজন আছে। তাই এই ধরণের উৎসবের মধ্য দিয়া আমরা আনন্দ এবং একই সঙ্গে ধর্মকর্ম করিয়া থাকি। ইহাকে 'অকাল বোধন' পূজাও বলা হয়। দেবী দুর্গার দশখানি হাত এবং তাহাতে বিচিত্র অস্ত্র। তাহার পদতলে সিংহ এবং আক্রমণাত্মক অসুর, মাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে দক্ষিণে গণেশ, কলাবউ এবং লক্ষ্মী এবং বামে সরস্বতী ও কার্তিকেয়। মাস খানেক

ধরিয়া প্রতিমা নির্মাণের প্রস্তুতি চলে। বর্তমানে শোলা, কাচ, ঝিনুক, পুঁতি প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের প্রতিমা দেখা যায়। দেবীর অঙ্গ নানাবিধ অলংকারে আবৃত থাকে। তিনদিন ধরিয়া চলে এই পূজার মহা উৎসব। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। এই পূজাকে কেন্দ্র করিয়া বালক-বৃদ্ধ সবাই নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়। বিভিন্ন শৌখিন দ্রব্যাদি ক্রয় এবং উত্তম খাওয়া দাওয়ায় এই তিনদিন কাটিয়া যায়। বিজয়াতে মিষ্টি মুখ করিয়া আমরা আমাদের ভালোবাসাকে কোলাকুলি এবং প্রণামের মাধ্যমে দৃঢ় করিয়া লই।

মেলা

বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন জায়গায় মেলা হয়। এই মেলা বিভিন্ন লোকের মিলন ক্ষেত্র। এই মেলা উপলক্ষে হরেক রকমের দোকান পাট তৈরি হয়। সেই সব দোকানে কাঠের শৌখিন জিনিস, খেলনা এমনকি আসবাবপত্র পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ ছাড়া থাকে সস্তা কাপড়-জামার দোকান, বিভিন্ন ফুল ও ফলের চারা গাছের দোকান, মিষ্টির দোকান প্রভৃতি। সাধারণতঃ গ্রামের দিকেই মেলার হার একটু বেশী। যে ক'দিন মেলা চলে সে ক'দিন খুব হৈ চৈ হয়। গ্রাম এবং শহরের বহু লোক এই মেলায় উপস্থিত হয় এবং একই সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে। প্রতি বছরই বেশ কিছু মেলা বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। বাচ্চা এবং মেয়ে মানুষেরাই আনন্দ পায় সবচেয়ে বেশি। মেলা উপলক্ষে থিয়েটার, পুতুল নাচ, নাগরদোলা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। প্রতি বছরই এই মেলার দিন কবে আবার আসবে তার জন্য সবাই অপেক্ষা করে।

ভ্রমণ

অচেনাকে চেনার, অদেখাকে দেখার কৌতূহল মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি। তাছাড়া শরীর সুস্থ রাখার তাগিদে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়। এমনি করে ঘুরে বেড়ানোর নামই ভ্রমণ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময় সুযোগ অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণে যায়। না দেখা অনেক কিছু সেখানে সে দেখতে পায় বলে আনন্দ উপভোগ করে। আবার না চেনা অনেক জিনিস চিনে সে জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এমনি করেই সে তার কৌতূহলী মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের জন্য বাড়তি সুবিধা দিয়ে থাকে। আজকাল বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের জন্য অনেক ভ্রমণ সংস্থা দেখা যায়। ভ্রমণ শুধু আনন্দ এবং অভিজ্ঞতার জন্য নয়, একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বও এর আছে।

টেলিভিসন

আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে টেলিভিসন। ১৯২৮ সালে ইংলণ্ডের জে. এল. বেয়ার্ড এই টেলিভিসন আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন দৃশ্যের প্রতিবিম্ব আমরা এর মাধ্যমে দেখতে পাই। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টেলিভিসন তৈরি হচ্ছে। ১৯৬৫ সালে ভারতে টেলিভিসন প্রথম চালু হয়। এর মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই শিক্ষা, আনন্দ ইত্যাদি পেতে পারি। সুতরাং এটা একটা আশ্চর্যজনক মাধ্যম। টেলিভিসনের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের দৃশ্য আমরা আজ ঘরে বসেই দেখতে পাই। এটা বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এর দাম একটু বেশী কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা হয়তো ঘরে ঘরে টেলিভিসন দেখতে পাবো।

কলকাতার পাতাল রেল

কলকাতার পাতাল রেল প্রায় শেষের পথে। মাটির তলায় রেল লাইন পাতা হবে আর আমরা রেলগাড়ি চেপে মাটির তলা দিয়ে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে বেড়াব এ যেন বিস্ময়ের বিষয়।

এই বিস্ময় আজ বাস্তব। পাতাল রেল আজ নিয়মিত যাতায়াত করছে। গাড়ি চলছে টালিগঞ্জ থেকে ধর্মতলা আর দমদম থেকে বেলগাছিয়া।

১৯৭৮ সালে পাতাল রেলের কাজ প্রথম শুরু হয়। দমদম জংশন থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পাতাল রেলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত অংশের কাজ এখন খুব দ্রুত গতিতে হচ্ছে।

দমদম থেকে টালিগঞ্জের মধ্যে মোট সতেরটি দোতলা স্টেশন হবে। উপরের তলায় থাকবে টিকিট ঘর, যাত্রীদের বিশ্রাম ঘর আর নীচের তলায় প্ল্যাটফর্ম বা স্টেশন। নামা ওঠার জন্য থাকবে আলাদা সিঁড়ি এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। ট্রেন না থামা পর্যন্ত দরজা খোলা যাবে না। আবার দরজা বন্ধ না হলে ট্রেনও চলবে না। একমাত্র হাতব্যাগ ভিন্ন অন্য কোন জিনিস সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করা যাবে না।

সমস্ত স্টেশন এবং গাড়ীগুলো থাকবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। যাতে যাত্রীদের কোনরকম অসুবিধা বা শ্বাসকষ্ট না হয়। পৃথিবীতে একমাত্র রাশিয়া ছাড়া আর কোন দেশে পাতাল রেল নেই। সেজন্যই পাতাল রেল আমাদের গর্বের সৃষ্টি। এই রেল পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে স্থাপিত হচ্ছে বলে প্রত্যেক ভারতবাসীই নিজেদের ধন্য মনে করবেন।

———